চক্রব্যূহে
সমীর ওয়াংখেড়ে

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

গুরু নানকের বাবরগাথা
বাবরের নৃশংসতার
জীবন্ত দলিল— পৃঃ ১১

৭৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১৫ নভেম্বর, ২০২১।। ২৮ কার্তিক- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

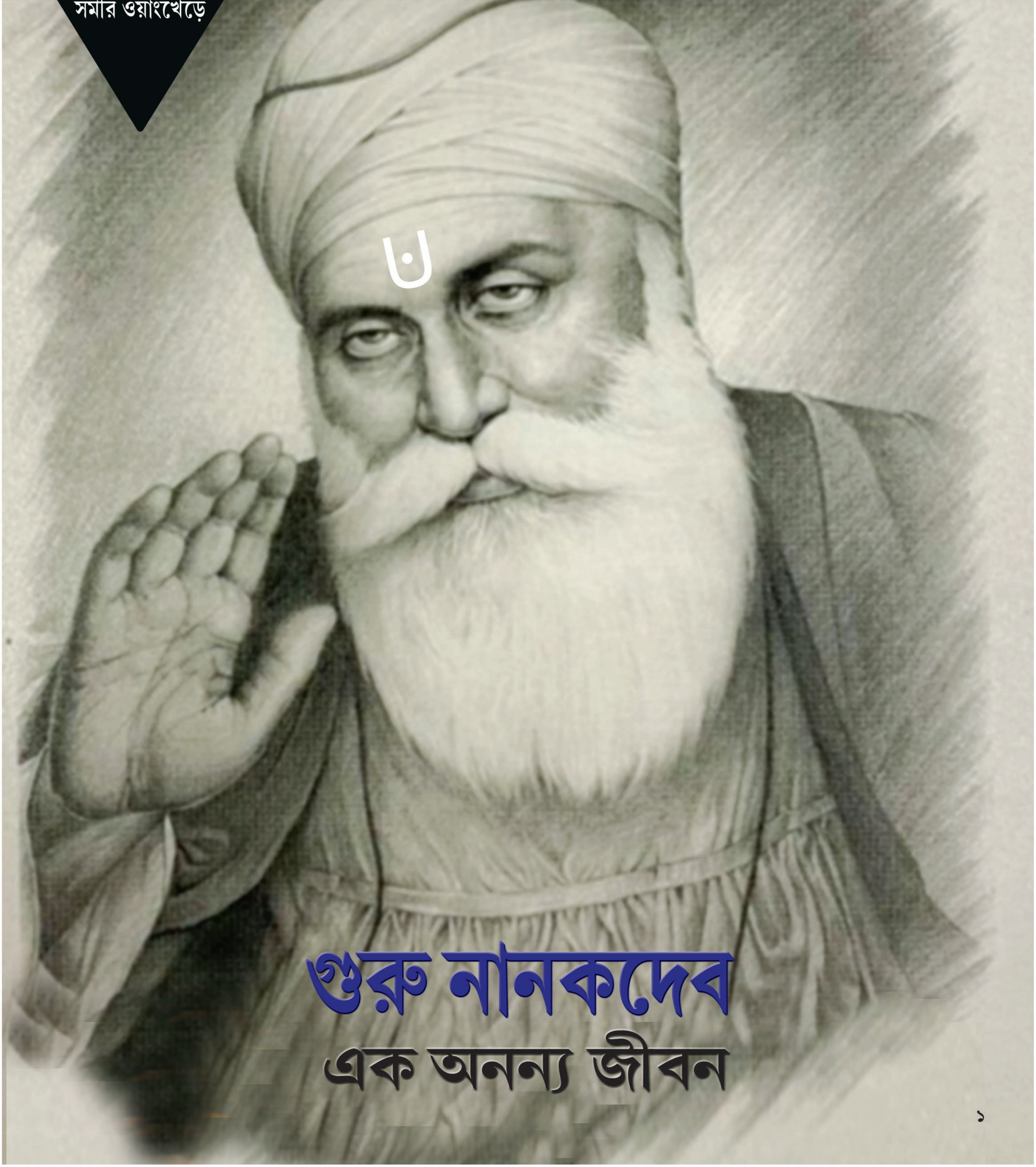

গুরু নানকদেব
এক অনন্য জীবন

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৮ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৫ নভেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

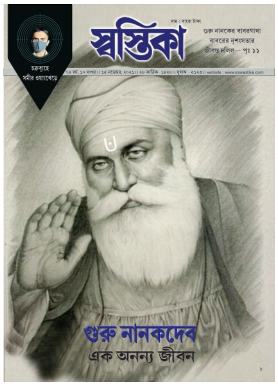

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতানামা : কী পারেন, কী পারেন না

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

হে ভারত, গর্বকে খর্ব করুন ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

জ্বালানিতে কেন্দ্রের কর ছাড় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়

◻ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৮

কেন্দ্র পেট্রোপণ্যে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করতেই মুখোশ খুলল বিরোধীদের ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

গুরু নানকের বাবরগাথা বাবরের নৃশংসতার জীবন্ত দলিল

◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ১১

বাংলাদেশে হিন্দুত্ব না থাকলে বাঙ্গালিয়ানাও থাকবে না

◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৩

আত্মত্যাগ ছাড়া রাজনৈতিক লড়াইয়ে শাশ্বত জয় অসম্ভব

◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ১৬

বুকের পাটা থাকলেই ঘুষখোর ◻ হীরক কর ◻ ২৩

অনন্য জীবনের অগ্রদূত গুরু নানকদেব ◻ রবি রঞ্জন সেন ◻ ২৮

সূর্যের ছটায় আলোকিত ছটমাঈয়া ◻ অমিতলাল ঠাকুর ◻ ৩১

মহাপ্রেম ও মহামিলনের উৎসব রাস ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩৩

এই আগুন নেভার পর ভস্ম ছাড়া কিছু থাকবে না

◻ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অভিবাসী নারী

◻ সুদীপ কুমার আচার্য ◻ ৩৮

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে ফেলার একটি নিয়মমাফিক ও সংগঠিত প্রচেষ্টা : দত্তাত্রেয় হোসবলে ◻ ৪৩

স্বাধীনতাযুদ্ধে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ, কুনোয়ার সিং ও কালোজী নারায়ণ রাও ◻ ৪৫

হিন্দুধর্মের সর্বনাশ এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য দমনমূলক ওয়াকফ আইন ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৪৭

মাস্ক নিয়ে মশকরা নয় ◻ কৌশিক রায় ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ চিত্রকথা ◻ ৫০

প্রকাশিত হবে
২২ নভেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ নভেম্বর
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচার

পশ্চিমবঙ্গে শিশু ক্রয়-বিক্রয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের ব্যবসা দিন-দিন বাড়ছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এই ঘৃণ্য ব্যবসা চলছে বলে দাবি করেছে কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচারের সাম্প্রতিক তথ্য-সংবলিত কয়েকটি রচনা। জানা যাবে নানা অজানা খবর।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ওয়াহে গুরুজী কী ফতেহ্

অমানিশায় নিমজ্জিত মানুষকে পথ দেখাইতে সবাই পারেন না। যাঁহারা এই কার্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারাই সমাজে, সংসারে, ইতিহাসে এবং সর্বোপরি মানুষের মানসপটে সিদ্ধপুরুষের রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। শিখ ধর্মগুরু গুরু নানাকদেব তেমনই একজন সিদ্ধপুরুষ। ভারতবর্ষ যখন ইসলামি শাসনের অমানিশায় নিমজ্জিত, এই দেশের মানুষকে যখন তাহাদের প্রাণসম্পদ স্বরূপ প্রাচীন ভাবশৃঙ্খলা হইতে তলোয়ার ও দিনারের জোরে উৎপাটিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে—তেমনই সন্ধিক্ষণে গুরু নানকদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন এবং কর্ম কেবলমাত্র শিখ ধর্মাবলম্বীদের মননকে আলোকিত করে নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন আনিয়েছিল।

১৪৬৯ সাল। প্রাচীন শিখ গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে, এই বৎসর নানকদেব অধুনা পাকিস্তানে অবস্থিত নানকানা সাহিবের অন্তর্গত তালওয়ান্দি গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মেহতা কালুজী ছিলেন গ্রামের হিসাবরক্ষক। মাতা তৃপ্তাজী গৃহান্তরীণ সাধারণ মহিলা। শিশুকাল হইতেই নানকদেব দৈবী ভাবাপন্ন। কিন্তু নানকদেবের মন ঈশ্বরভাবের আধার হইলেও তাহার চলনটি যুক্তিনিষ্ঠ। ঈশ্বরের আরাধনার সহিত কাণ্ডজ্ঞানের যে কোনও বিরোধ নাই তাহা তাঁহার বাল্য-বয়েস হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। যেই কারণে কুসংস্কার এবং জাতবিচারের কূপে পতিত তৎকালীন দেশীয় সমাজপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাঁহার বাধে নাই। তিনি স্পষ্টতই জাতপাত এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন ধর্ম হইল জীবনশৈলী। জীবন ব্যতিরেকে ধর্মের পালন সম্ভব নহে। এবং তাহার এই ধারণা আরও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল ভগবত্তা অর্জনের পর। সেই ঘটনাও যথেষ্ট চমকপ্রদ। বয়োবৃদ্ধির পর গুরু নানকদেব ইব্রাহিম লোদির প্রশাসনে কর্মরত। সারাদিন কর্মোপলক্ষ্যে কাটিয়া যায় কিন্তু ভোরবেলায় এবং গভীর রাত্রিতে নানকদেব ঈশ্বরের ভজনা করেন। তাঁহার রচিত সংগীত রবার বাজাইয়া পরিবেশন করেন তাঁহারই অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভাই মারদানা নামের এক মুসলমান যুবক। এই সময় একদিন নদীতে স্নান করিতে যাইয়া তিনি ঈশ্বরের আহ্বান শুনিতে পান। তাঁহার পরবর্তী জীবন মানবকল্যাণে অতিবাহিত তাহা সেইদিন ঈশ্বরই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গ্রন্থসাহিব-সহ প্রাচীন শিখ গ্রন্থসমূহ ঈশ্বরোপলব্ধির এই উপাখ্যান এবং তৎপরবর্তীকালে নানকদেবের জীবনপথ পরিবর্তনের ঘটনাকে মান্যতা দিয়াছে।

ভারতবর্ষের সিদ্ধপুরুষেরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ধ্যানলব্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজনের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। বৈদিক ঋষিরা ছিলেন পরিব্রাজক। আদিগুরু শংকরাচার্যকে আমরা পরিব্রাজকের ভূমিকায় দেখিয়াছি। অতপর নানকদেবকেও দেখিলাম। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ-সহ দক্ষিণ এশিয়া, তিব্বত এবং আরবে পরিব্রাজন করিয়াছেন। এই সময় তিনি অগণিত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং তাহাদের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কহিয়াছেন—ওয়াহে গুরুজী কী ফতেহ্। অর্থাৎ ঈশ্বরের জয় হোক। তাঁহার ঈশ্বর নিরাকার (নিরঙ্কার), নির্ভয় (নির্ভাউ), ঘৃণাহীন (নির্বৈর), একমেবাদ্বিতীয়ম্ (এক) এবং স্বপ্রকাশ (সাইভাঙ্গ)। তাঁহার ঈশ্বর এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা। তাঁহার মতো প্রেম প্রীতি ও শান্তির বার্তাবাহী।

বর্তমানে আমরা এমন এক পৃথিবীর অংশবিশেষ যেখানে দিবারাত্র মৌলবাদের পদধ্বনি শোনা যায়। কেবলমাত্র হিন্দু হইবার অপরাধে বাংলাদেশে পাকিস্তানে মানুষের প্রাণ যায়। শিখ সমাজকে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার কর্মভূমি কার্তারপুর সাহিব ছাড়িয়া দেওয়ার হুমকি প্রদর্শন করে পাকিস্তানের আঞ্চলিক প্রশাসন। এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়ে গুরু নানকদেবের মত ও পন্থার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বাড়িতেছে এবং আগামীদিনে আরও বাড়িবে।

সুভাষিতম্

বিহায় পৌরুষং যো হি দৈবমেবাবলম্বতে।

প্রাসাদসিংহবৎ তস্য মূর্ধ্নি তিষ্ঠতি বায়সাঃ।।

পরিশ্রম না করে যে শুধুই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে চলে, সে প্রাসাদের সিংহমূর্তির মতো, যার মাথায় কাক অবস্থান করে।

মমতানামা : কী পারেন, কী পারেন না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—

● বিজেপি/কংগ্রেস/বামকে নির্বাচনে ধরাশায়ী করতে পারেন, রাজধর্ম পালন করে বিরোধীদের উপর অত্যাচার আটকাতে পারেন না।

● দলের পুরোনো কর্মীদের 'গদ্দার' বলে ডাকতে পারেন, 'গদ্দার'দের দলে ফিরিয়ে নেওয়া আটকাতে পারেন না।

● দলের যুব সুপ্রিমো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী বলে ইঙ্গিত দিতে পারেন— কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ ধরে রাখার জন্য দুবার করে নির্বাচন লড়তে পিছপা হতে পারেন না।

● শিল্প সম্মেলন করতে পারেন, বড়ো শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, বড়ো শিল্প আনতে পারেন না। ক্ষুদ্র মাঝারিকে না তুলে ধরে থাকতে পারেন না।

● প্রাপ্য কেন্দ্রীয় অর্থ দাবি করতে পারেন, পেট্রোপণ্যে রাজ্য করের অংশ ছাড়তে পারেন না। এই পণ্যে ১০ বছরে রাজ্যের ২০০ শতাংশ রাজস্ব বেড়েছে— ২৬০০ কোটি থেকে আনুমানিক ৮০০০ কোটি।

● নিষ্ঠাভরে দুর্গাপূজা, কালীপূজা করতে পারেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করতে পারেন না।

● বিভিন্ন পুজো কমিটিকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন, সরকারি কর্মীদের ন্যায্য ডিএ দিতে পারেন না।

● বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প তৈরি করে দুয়ারে দুয়ারে ভোট চাইতে পারেন, প্রকল্প লাগু হচ্ছে না কেন তার তদন্ত করতে পারেন না।

● সিট গঠন করে রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অভিযোগ তদন্ত করতে পারেন, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সহযোগিতা করতে পারেন না।

মমতার ভবানীপুরে জয় কোনও ম্যাজিক নয়। তাহলে উপনির্বাচনে মমতার ম্যাজিকটা কী? তলিয়ে ভাবলে বুঝতে পারবেন মমতা কী পারেন আর কী পারেন না।

● তোলাবাজি আর বেআইনি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জোরদার তোপ দাগতে পারেন, দাগি কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

● কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পুত্রের আচমকা সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে সরব হতে পারেন, রাজ্যের পণ্যচিহ্ন শাহরুখ খানের ছেলের মাদকচক্রে যোগের নিন্দা করতে পারেন না।

● কর্মসংস্থানের বাগাড়ম্বর করতে পারেন, শিক্ষকদের সময়মতো প্রাপ্য চাকরি দিতে পারেন না।

পাঠকরা মাফ করবেন। মমতা কী পারেন আর পারেন না তার তালিকা দীর্ঘ হতে পারে। আমি একটা ঝলক দিলাম। এটা মানতে অসুবিধা নেই যে মমতা ব্যতিক্রমও বটে। একক প্রচেষ্টায় পরপর তিনবার নির্বাচনে আসন বাড়িয়ে জিতে আসা অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যতিক্রম। নরেন্দ্র মোদীও চার বার রাজ্য নির্বাচন জিতেছিলেন। জ্যোতি বসু আর নবীন পট্টনায়কও। তাঁদের সঙ্গে দল ছিল। এখানে মমতাই দল। সেটাই ব্যতিক্রম।

রাজ্যের চারটি উপনির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। দলের দিল্লির নেতারা এখানকার নেতাদের বাহবা দিয়ে মনোবল বাড়াতে বলেছেন। এপ্রিল-মে-র রাজ্য নির্বাচনে পরাজিতদের জাতীয় স্তরে জায়গা দেওয়া হয়েছে। হারের মুখে কয়েকজন আবার গণনা কেন্দ্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ছ' মাস আগে বিজেপি প্রার্থীরা যে আসনে প্রায় ১ লক্ষ করে ভোট পেয়েছিলেন ছ' মাস পরে সেই আসনেই তারা ১ লক্ষ ভোটে হেরে গিয়েছেন। জমানত জব্দ হয়েছে।

অবাক কাণ্ড! পাঠকরা ভাবুন কী এমন ঘটল যে ছ'মাসের মধ্যে মমতা বিজেপিকে নিঃশেষ করে দিল। তাঁর ভবানীপুরে জয় কোনও ম্যাজিক নয়। তাহলে উপনির্বাচনে মমতার ম্যাজিকটা কী? তলিয়ে ভাবলে বুঝতে পারবেন মমতা কী পারেন আর কী পারেন না। আশা করি উত্তর পেয়ে যাবেন।

হে ভারত, গর্বকে খর্ব করুন

মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলী
প্রগতিশীল সংবাদপত্র

এ চিঠি যাঁদের উদ্দেশে লেখা আমার চোখে তাঁরা অনেক দূরের গ্রহের বাসিন্দা। আমার মতো এক সাধারণ মসিজীবীর পক্ষ থেকে তাঁদের খোলা চিঠি লেখা যায় কী না তাই আমার জানা নেই। তবু সাহসে ভর করে লিখছি। আপনারা সকলেই বিভিন্ন নামি ও দামি সংবাদপত্রের প্রগতিশীল সম্পাদক। আচ্ছা, ভারতের গর্বের কিছু বিষয়কে আপনারা ছোটো করে দেখাতে কেন ভালোবাসেন তা বলতে পারেন?

গত কিছুদিন ধরে দেখছি আপনারা বড়ো বড়ো করে লিখছেন, 'মোদীর আমলে ভারতীয় পাসপোর্টের শক্তি দিন দিন কমছে।' আর এই কমাটা মনমোহন সিংহ জমানার তুলনায় অনেকটাই বেশি বলেই দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বে ভারতীয় পাসপোর্টের গুরুত্ব ও শক্তি বাড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি গোয়ায় বিজেপির কর্মীসভায় ভারতীয় পাসপোর্টের শক্তি বৃদ্ধির দাবি করেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গত ১৪ অক্টোবর গোয়ায় বিজেপির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শাহ। সেখানে তিনি দাবি করেন, মোদী জমানায় বিশ্বে ভারত সম্পর্কে ধারণা বদলাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারতীয় পাসপোর্ট দেখানোর সময় আগের এবং এখনকার মনোভাবে অনেক বদল এসেছে। ভারতীয় পাসপোর্ট দেখালেই বিদেশের কর্মীদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করেন, আপনি কী মোদীজীর দেশ থেকে এসেছেন?' একখানা পাসপোর্ট থাকলেও আমি কস্মিনকালেও বিদেশ যাইনি। ফলে জানা নেই কেমন সম্মান পাওয়া যায়। তবে আপনারা যেভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিন্দা করছেন এবং তাঁকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইছেন একজন ভারতীয় হিসেবে সেটা আমার চোখে লজ্জার।

এটা ঠিক যে, বিশ্ব পাসপোর্ট সূচকে ১৯৯ দেশের মধ্যে ২০১১ সালে ভারতের স্থান ছিল ৭৮ নম্বরে। ২০২১ সালে সেটা হয়েছে ৯০। কোন দেশের পাসপোর্টের গুরুত্ব কত, তা নির্ভর করে সেই দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়া কত দেশে যেতে পারেন, তার উপরে। গত ১০ বছরে ভারত দেশের সংখ্যা ছ'টি বাড়াতে পেরেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশও এই ক্ষেত্রে এগিয়েছে। আর তার জেরেই শেষ দশ বছরে বিশ্ব পাসপোর্ট সূচকে ৭৮ থেকে ৯০-তে নেমেছে ভারতীয় পাসপোর্ট। এই ব্যাখ্যাটা আপনারা দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন সূচকে স্থান নেমেছে।

কোনো দেশের পাসপোর্টের গুরুত্ব বা শক্তি কতটা তা জানা যায় 'দ্য হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স' দেখে। মূলত ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএটিএ) এই সূচক তৈরি করে। ২০০৬ সাল থেকে এই তালিকা প্রকাশ শুরু হয়। এই তালিকায় প্রত্যেক দেশেরই অবস্থান ওঠানামা করে। সর্বশেষ তালিকায় ১৯৯টি দেশের মধ্যে সবার উপরে রয়েছে জাপান ও সিঙ্গাপুর। এই দুই দেশের নাগরিকরা ১৯৯-এর মধ্যে ১৯৩ দেশেই ভিসা ছাড়া যেতে পারেন। দ্বিতীয় স্থানে জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যা ১৯০। আর তৃতীয় স্থানে ১৮৯-তে রয়েছে চারটি দেশ। ফিনল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও স্পেন। এই তালিকায় সবার শেষে ১১৬ নম্বরে রয়েছে আফগানিস্তান। তার একটু আগে ১১৩-তে পাকিস্তান। ১০৮-এ বাংলাদেশ।

তবে যে কথাটা আপনারা বলেননি সেটা আমি সব শেষে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। ওই ক্রমতালিকায় ভারতের স্থান ২০১৩ সালে ছিল ৭৪ নম্বরে। তখন ভিসা ছাড়া ভারতীয়রা যেতে পারতেন ৫২টি দেশে। নরেন্দ্র মোদী জমানায় সেটা হয়েছে ৫৮।

ভিসা ছাড়াই ভারতীয়রা যেতে পারেন ওশিয়ানিয়া অন্তর্ভুক্ত দেশ কুক দ্বীপপুঞ্জ, নিউয়ে, ভানুয়াতু, মাক্রোনেশিয়া এবং ফিজিতে। পৌঁছানোর পরে ভিসা নিতে হয় মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, পালাউ দ্বীপপুঞ্জ টুভালু ও সামোয়ায়। পশ্চিম এশিয়ার দেশের মধ্যে কাতারে যেতে কোনও ভিসা লাগে না। ইরান ও জর্ডনে ঢুকে ভিসা নিতে হয় ভারতীয়দের। ইউরোপের আলবেনিয়া ও সার্বিয়ায় যেতে ভিসার প্রয়োজন নেই। ক্যারিবিয়ান দেশগুলির মধ্যে এই সংখ্যা বেশ ভালো। বারবাডোজ, ব্রিটিশ ভারজিন দ্বীপপুঞ্জ, ডোমিনিকা, গ্রেনাডা, হাইতি, জামাইকা, মন্তসেরাট, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিজ, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো যেতে ভিসাই লাগে না। গিয়ে ভিসা নিতে হয় সেন্ট লুসিয়ায়।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রতিবেশী ভুটান, নেপাল ছাড়াও ভিসা লাগে না ম্যাকাও ও ইন্দোনেশিয়া যেতে। গিয়ে ভিসা পাওয়া যায় কম্বোডিয়া, লাওস, মালদ্বীপ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, টিমর-লেসটে ও তাইল্যান্ডে। আমেরিকা মহাদেশের বলিভিয়ায় গিয়ে ভিসা নিতে হয় আর এল সালভাডোর যেতে ভিসাই লাগে না। আফ্রিকা মহাদেশের বত্সোয়ানা, কেপ ভার্ডে দ্বীপপুঞ্জ, কোমোরেস দ্বীপপুঞ্জ, ইথিওপিয়া, গাবোন, গেনিয়া বিসাউ, মাদাগাস্কার, মৌরিশিনিয়া, মোজাম্বিক, রাওয়ান্ডা, সেশেলস, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, উগান্ডা, জিম্বাবোয়ে টোগো, তানজিনিয়ায় গিয়ে ভিসা নেওয়া যায়। মরিশাস, টিউনিশিয়া, সেনেগাল যেতে ভিসাই লাগে না।

এই চিঠি লেখার জন্য অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনারা পণ্ডিত মানুষ। আপনাদের জ্ঞান দেওয়া আমায় মানায় না। তবে হাতে যখন কলম আছে তখন বলতে বাধা কোথায়। দেশের গর্বকে খর্ব করার মধ্যে কিন্তু কোনও গর্ব নেই। ▫

জ্বালানিতে কেন্দ্রের করছাড় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়

এই কর ছাড় অর্থনীতির ওপর চাপ অনেকটাই হালকা করবে। বাস্তবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ কমিটির সদস্যরা বারবার সরকারকে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি যেন একসাথে মিলেমিশে সংহতভাবে তেলের দাম কমায় যাতে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বসে আনা যায়।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চরমপন্থার প্রভাব বহু সময় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তেড়ে ফুঁড়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গতিপথ, অর্থ সংস্থান, অর্থনৈতিক অনুদান কতটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে এনিয়ে তিলমাত্র মনোযোগ না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ভরতুকি দিয়ে জনমনে প্রভাব সৃষ্টির এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা চলছে। এই রাজ্যে এই লাগামছাড়া, চিন্তাহীন অনুদানভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজকোষের অভাব দেখিয়ে, অর্থ না দেওয়ায় একটি হাসপাতাল ইতিমধ্যেই ৫৯ কোটি টাকা সরকারের থেকে আদায় করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এই সূত্রে বিশিষ্ট শল্য বিশারদ ও একটি বিখ্যাত হাসপাতাল পরিচালক সম্প্রতি জানিয়েছেন এই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে লাগামছাড়া বিনামূল্যে রোগী পরিষেবা দিতে গেলে গোটা হাসপাতালের পরিবেশটাই ভেঙে পড়বে। তিনি কোনো দলীয় সমর্থক হিসেবে নয় কেবলমাত্র দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সংবলিত হাসপাতাল পরিচালক হিসেবে বলেছেন সরকার বিভিন্ন অপারেশনের ক্ষেত্রে যে খরচ নির্ধারণ করেছেন সেটিকে মান্যতা দিলেও হাসপাতালের ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসা ছাড়াও আরও চিকিৎসা হয় সেখানে রোগী ভর্তি হলে তাকে শুশ্রূষা দিতে মাথাপিছু একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের দৈনিক খরচ না করলে হাসপাতালের অর্থনীতিটাই বিধ্বস্ত হয়ে

পড়বে। তিনি অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে বলেছেন এমনটা দীর্ঘদিন চলতে পারবে না। হসপিটালগুলিকে নাচার হয়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলির দিকে পা বাড়াতে হবে। তাহলে, চটজলদি জনপ্রিয়তার টাকা যা আদতে রাজ্যের মানুষেরই অর্থ তা দিয়ে বিনা পয়সায় সেবা কার্য চালানোর হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতিতে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রাইভেট হাসপাতালগুলির আর অস্তিত্ব থাকবে না। এই সূত্রে ৭০ এর দশকে শ্রমিক পরিপূর্ণ সংস্থাগুলির মালিকের কাছে কমিউনিস্টদের শ্রমিক মঙ্গলের নামে অযৌক্তিক ও আকাশচুম্বী দাবি ও অনাদায়ে অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। এর এক দশকের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ পুঁজিপতি কারবার গুটিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন। তখনই বোধহয় তাদের রাজ্যের বাইরের কারখানাগুলিতে কাজ করতে যাওয়ার মাধ্যমে 'পরিযায়ী শ্রমিক' কথাটির জন্ম হয়। এই যে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কল্যাণকারী সিদ্ধান্তটি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে চাপিয়ে দেওয়া হলো এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীই বঞ্চিত হতে চলেছে। সরকারি হাসপাতালগুলির পরিষেবা সকলেই জানেন তারা বাড়তি হাজার হাজার রুগির চাপে বিস্ফোরণের বিন্দুতে পৌঁছবে। ফলে রাজ্যে 'পরিযায়ী স্বাস্থ্য সেবাপ্রার্থীর' বিপুল সংখ্যার জন্ম হবে।

আজকে সরকার তেলের দাম দীর্ঘ বিবেচনার পর কিছুটা কমিয়েছে (কর ছাড় দিয়ে)। এটিকে সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আগামী ছ' মাসে বেশ কিছু রাজ্যে ভোট হবে। আমাদের দেশের ৩৩টি রাজ্যে পাঁচ বছর ধরেই ভোট হয়। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় কল্যাণমুখী কোনো প্রকল্প এলেও হয়তো সেগুলিকে ভোটমুখী আখ্যা দেওয়া হতে পারে।

লক্ষণীয় বর্তমানে করোনার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জোয়ার এসেছে। সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায়

এটা বুঝেছে যে কর কমানোয় যে পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হবে দেশে বাড়তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে তেলের চাহিদাও অনেক বাড়বে ছাড় দেওয়া কর পুষিয়ে নেওয়া যাবে। এখানে রাজনীতি করার মতো অভিযোগ জানানো অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। শুধু তাই নয় অনেকে বলছেন এখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার ফলেই সরকার নিরুপায় হয়ে দাম বাড়াচ্ছে। তারা কর ছাড় এত দিন না দিয়ে জনগণের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়েছে। পূর্ববতী বিরোধী সরকারের আমলেও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছিল কিন্তু জনসাধারণের জন্য খুচরো মূল্য বৃদ্ধি তো এমন লাগাম ছাড়া হয়নি? সেই সময় সরকার তেল বিক্রেতা সংস্থাগুলির ক্ষতি মেটাতে কোটি কোটি টাকার বন্ড দিয়েছিল যাতে সরকারের ভবিষ্যতে তেল বর্ধিত দামে কিনে কম দামে বেচার ব্যবধানটি চুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই সরকার চলে গেছে জনতার মন খুশি করে গতি বাঁচানোর ভরতুকির বন্ডের পাওনা বর্তমান সরকার মেটাচ্ছে। সকলেই জানেন দেওয়ালির আগের দিনে সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বহু রাজ্য সরকারও তাদের প্রাপ্য করে ভাল ছাড় দিয়েছে। এই দুটি মিলিয়ে বর্তমানে তেলের দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। যাকে বিশেষজ্ঞরা পর্যাপ্ত মনে করছেন। এর ফলে অর্থনীতিতে বাড়তি দামের চাপ কমবে বলেই তাঁদের অভিমত। উত্তর প্রদেশের ভোট আসছে বা হিমাচল প্রদেশে শাসকদলের আসন হারানোর মতো বিকৃত প্রচার এখানে চালিকা শক্তি কখনই নয়। এই তেলের মূল্য হ্রাসের তিনটি অর্থনৈতিক যুক্তিগ্রাহ্যতা আছে। (১) যারা অর্থনীতির ফলাফলে নজর রাখেন তারা দেখবেন সরকারের সামগ্রিক কর আয় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) উভয়ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি হওয়ায় তেল ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। কিছুটা সুযোগ নিশ্চিত পাওয়া গেছে। বন্ড ছেড়ে ভবিষ্যতে জনগণ ও সরকারকে দেউলে করার সিদ্ধান্ত এটা নয়। গত বছরের তুলনায় ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, করোনা পূববর্তী বছরের তুলনায় তা ২৮ শতাংশ বেড়েছে। অত্যন্ত আশার কথা শুনিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে, এই বৃদ্ধি জারি থাকলে এই অর্থবর্ষের কর আদায় বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকেও বিপুলভাবে ছাড়িয়ে যাবে। এগুলি পরিকল্পিত সামগ্রিক অর্থনীতি পরিচালনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সস্তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলে যা প্রচার হচ্ছে তার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। প্রসঙ্গত গত বছর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেকটাই কমে গিয়েছিল। সরকার কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়ে পেট্রলে ১৩ টাকা ও ডিজেলে ১৬ টাকা excise duty বাড়িয়েছিল। অর্থাৎ দাম বাড়িয়েছিল। এর ফলে সরকার বাজেটের তেল ক্ষেত্রে কর আদায়ের ২.৬৭ লক্ষ কোটি টাকার লক্ষমাত্রাকে ৩.৬১ লক্ষ কোটি আদায়ের মাধ্যমে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈরি হয়েছিল আপৎকালীন রাজকোষ। আজকের এই কর ছাড় অর্থনীতির ওপর চাপ অনেকটাই হালকা করবে। বাস্তবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ কমিটির সদস্যরা বারবার সরকারকে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি যেন একসাথে মিলেমিশে সংহতভাবে তেলের দাম কমায় যাতে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বসে আনা যায়।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরিসংখ্যান বিশারদ সংস্থা Nomura'র মতে, সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ১.৪ থেকে ০.০৩ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত কমবে। তৃতীয়ত, সরকার মনে করছে এই দাম কমানোর ফলে মানুষের মধ্যে খরচের প্রবণতা বাড়বে। সে কিছুটা ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র আগের চেয়ে কম দামে পাবে যাতে অর্থনীতির সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটবে। অন্য একটি বলিষ্ঠ অভিমত অনুযায়ী সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতি আসায় এই কর হ্রাস বাবদ ক্ষতি তেলের বর্ধিত চাহিদার মাধ্যমে উঠে আসবে। এই রাজস্ব ক্ষেত্রে স্বস্তির বাতাবরণ সরকারকে বাজেটে অন্যান্য বহুক্ষেত্রে যে খরচের পরিকল্পনা ছিল সেগুলি দ্রুত রূপায়ণের সহায়ক হবে। বছরের প্রথম ষান্মাসিকে যে খরচ কিছুটা স্তিমিত ছিল সেপ্টেম্বর থেকেই তাতে গতি এসেছে। সরকার তার দাবি আড়াই বছরে একটি পরিকল্পিত, চিন্তাপ্রসূত পথেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলবে। ভবিষ্যতে দেশ দেউলে করা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের গদি ঠিক রাখার ঠুনকো অপরিণামদর্শী ও হটকারী পথ যে কখনই অবলম্বন করবে না এমনটা আশা করা যায়।

(সংগৃহীত। সংগ্রাহক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund | HDFC MUTUAL FUND | SBI MUTUAL FUND A partner for life.

কেন্দ্র পেট্রোপণ্যে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করতেই মুখোশ খুললো বিরোধীদের

পেট্রোপণ্যের উৎপাদন শুল্কে কেন্দ্র ছাড় ঘোষণা করতেই মুখোশ খুলে পড়ল তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিরোধীদের। পেট্রোল, ডিজেলের বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন্দ্র মানুষকে সুরাহা দিতে অতি সম্প্রতি পেট্রোপণ্যে উৎপাদন শুল্কে হ্রাস টেনেছে। যার সুফল সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন, আগামীদিনে নিশ্চিত আরও পাবেন। এমতাবস্থায় রাজ্যগুলি যদি তাদের প্রাপ্য পেট্রোল- ডিজেলের উৎপাদন শুল্কের ওপর মূল্য-যুক্ত কর বা ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স)-এর কিছুটা ছেড়ে দেয় তবে পেট্রোপণ্যের দাম আরও বেশ কিছুটা কমবে। কেন্দ্রের থেকে সেই আবেদনও রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্য তাতে সাড়া দিলেও কমিউনিস্ট শাসিত কেরল কিংবা তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান, পঞ্জাব বা ছত্তিশগড়; টিআরএস শাসিত তেলেঙ্গানা, ইউপিএ শাসিত মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু কেউই তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ পেট্রোপণ্য থেকে তাদের বিপুল আয় বন্ধ হয়ে গেলে রাজ্যের কোষাগারের হাঁড়ির হাল হবে। তাই এই ঘটনার পর স্পষ্ট হয়ে গেছে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা তাকে জিএসটির আওতায় নিয়ে আসা নিয়ে বিরোধীদের আদৌ কোনো মাথাব্যথা ছিল না, বরং তারা গোটা পরিস্থিতিটা উপভোগ করছিলেন, বিশেষ করে এতে কেন্দ্রের এ ব্যাপারে নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অস্থিরতা তৈরির ছকও বানচাল হলো।

জিসটি-র আওতায় যখনই পেট্রোপণ্যকে আনার দাবি তুলেছে বিরোধীরা তখনই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, তারা রাজি হতে পারে, যদি রাজ্যগুলো রাজি হয়। এ ব্যাপারে আন্দোলনে যেতে বিরোধী দলগুলি যতটা আগ্রহী, পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-র আওতায় আনতে তারা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে ততটাই অনাগ্রহী। এ রাজ্য থেকে জিএসটি কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য অমিত মিত্র। তিনি কাউন্সিলের মিটিঙে কখনো পেট্রোপণ্যকে জিএসটির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছেন বলে শোনা যায়নি। অথচ তাঁর দল এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট, বিধানসভা, এমনকী রাস্তাতেও; সর্বত্রই সরব। এখন প্রশ্ন, এই দ্বিচারিতা কেন?

আন্দোলন করা হয় নিছক আন্দোলনের জন্য, যাতে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নির্বাচনে ফায়দা লোটা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক বাস্তবতাটা যে যে রাজ্যে বিরোধীদের শাসনে প্রশাসন পরিচালিত হয়, তারা ভালোই উপলব্ধি করত পারছেন। শুধু এ রাজ্যের কথাই ধরা যাক। চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। বেকারত্ব, কলকারখানা বন্ধ, তার ওপর রাজ্যের ঋণের বোঝা; অস্বীকার করার উপায় নেই রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন বাম আমলেই শুরু হয়েছিল, তৃণমূল দল সরকারে এসে তাকেই ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

ফলে রাজ্যের এখন দেউলিয়া দশা। কোনো শিল্প এ রাজ্যে আসে না, বেকারত্বও চরমে উঠেছে। এই অবস্থায় ভোটের দিকে তাকিয়ে রাজ্যবাসীর মন জয় করতে রাজ্য অন্তত এক ডজন বড়ো আর্থিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে প্রত্যেক নাগরিকের মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক-বন্ধু ইত্যাদি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি রাজ্যের নিম্ন আয়ের পরিবারের মা-বোনেদের জন্য পাঁচশো টাকা এবং তাঁরা তফশিলি জাতি-উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হলে হাজার টাকা প্রতি মাসে দিতে রাজ্য সরকারের বাজেট প্রতি বছর গিয়ে দাঁড়াবে অন্তত পক্ষে ১৮ হাজার কোটি টাকা। রাজ্য এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে খরচ করেছে ১০৮২ কোটি টাকা। নতুন কৃষক বন্ধু প্রকল্পেও আছে বিশাল খরচের ধাক্কা। এইসব সামলাতে এতো টাকা আসবে কোত্থেকে?

করোনা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বেরই অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। সে প্রসঙ্গ না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, করোনা-পূর্ব সময়েও রাজ্যের মাথায় বিপুল ঋণের বোঝা, কেন্দ্রের কাছে অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন স্রেফ কর্মচারীদের বেতন মেটানোর জন্য। তাও তাদের বকেয়া মেটানো যায়নি। এ রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ষষ্ঠ বেতন কমিশন নিয়ে রাজ্য সরকারের টালবাহানাও মনে না থাকার কারণ নেই। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানুষের জন্য কিছু করার সদিচ্ছা যদি সত্যিই রাজ্য সরকারের থাকতো তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারতো রাজ্য, যেমন স্বাস্থ্যবিমার জন্য 'আয়ুষ্মান ভারত', কৃষকদের আর্থিক অনুদানের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক যোজনা'। এর মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল, রাজ্য থেকে আদায় করা করের টাকা এভাবেই রাজ্যে ফিরে আসবে।

মমতা-সহ বিরোধীদের যুক্তি, পেট্রোপণ্য থেকে কেন্দ্রের আয় অনেক বেশি। কিছুটা বেশি ঠিকই, তবে অনেকটা নয় কোনোমতেই। আর এ প্রসঙ্গে বলা দরকার কেন্দ্রের অর্থনৈতিক দায় ও দায়বদ্ধতাও অনেক বেশি রাজ্যগুলির চেয়ে। যাইহোক, কেন্দ্র উৎপাদন শুল্ক কমানোর পর লিটার প্রতি পেট্রোল থেকে আয় করছে ২৭ টাকা ৯০ পয়সা, ডিজেলে ২১ টাকা ৮০ পয়সা, অন্যদিকে রাজ্যগুলির আয় লিটার প্রতি পেট্রোলে ২০ টাকা ২৩ পয়সা, ডিজেল ১২ টাকা ৭২ পয়সা।

এর ফলে কেন্দ্র যেমন তার কোষাগার কিছুটা কম ভরবে, একইসঙ্গে রাজ্যগুলোও কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করুক। তবেই মানুষের অনেকটা সুরাহা হবে। নইলে মমতার লোকদেখানো পেট্রোপণ্যে মাত্র একটাকা ছাড়ে মানুষ বিন্দুমাত্র উপকৃত হননি। ছত্তিশগড়ে ছাড় কিছু বেশি হলেও সেখানকার পরিস্থিতিও তথৈবচ। বিরোধীরা নিজেদের মুখ একবার আয়নায় দেখুন। কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন শুল্কে ছাড়ের ঘোষণা করে সেই আয়নাটা নির্মাণ করে দিয়েছে। ◘

গুরু নানকের বাবরগাথা বাবরের নৃশংসতার জীবন্ত দলিল

নিখিল চিত্রকর

‘এক পবন, এক হি পানি, এক জ্যোতি সংসারা
এক হি খাক গড়ে সব ভাণ্ডে, এক হি সৃজনহারা।’

এক বায়ু একটাই সূর্য। এক মাটিতেই গড়া নশ্বর দেহ, একজনই সৃজনকর্তা। এক ওঙ্কার সত্যনাম পরম পুরুষের কীর্তনেই আস্থা ছিল তাঁর। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ, সে তো ঈশ্বরের সৃষ্টির চরম অবমাননা! তাঁর প্রবচন দূর করেছিল সামাজিক বৈষম্য। তিনি শ্রীগুরু নানকদেব।

গুরু নানকদেব ও মুঘল সম্রাট বাবর সমসাময়িক ছিলেন। বাবরের ভারত আক্রমণ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন শিখপন্থের প্রতিষ্ঠাতা নানকদেব। বাবরের অত্যাচারে ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। কীভাবে বাবর আমাদের শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষকে তছনছ করছিল, তাই নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ‘বাবর গাথা’ নামক প্রমাণ্য কাব্যকৃতি।

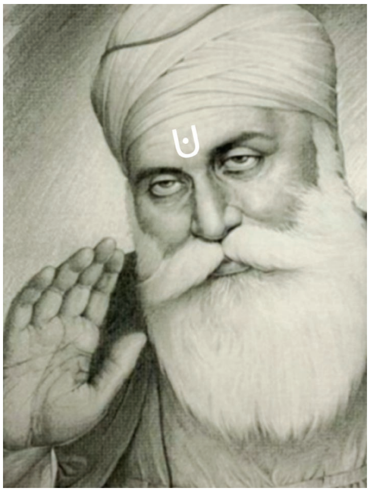

বাবরের ভারত আক্রমণ এবং মুঘলদের অত্যাচারে গুরু নানকদেব কত ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন তা এই কাব্যকৃতি থেকে জানা যায়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে তিনি যথেষ্ট নিরাশ ও হতাশ ছিলেন। কিন্তু সবটাই ঈশ্বরের লীলা মেনে নিয়ে সহ্য করেছিলেন।

গুরু নানকদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৯ সালে। পৃথিবীতে তাঁর জীবনকাল ১৫৩৯ সাল পর্যন্ত। বাবর ভারতে প্রথম আক্রমণ করে পঞ্জাবের এমনাবাদ অঞ্চলে ১৫২২ সালে। সেই সময় তিন বছরের বিদেশ ভ্রমণ শেষে স্বদেশে ফিরেছেন নানকদেব। খবর পেলেন, বাবরের খুনি সৈন্যবাহিনী এমনাবাদের হাজার হাজার নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটিকে মৃতনগরীতে পরিণত করেছে। এমনাবাদের প্রজাদের প্রতি সমবেদনায় তিনি ভারাক্রান্ত হলেন। ছুটে গেলেন অকুস্থলে। চারদিকে রক্ত আর ধ্বংসের স্তূপ দেখে, শোকাতুর হয়ে তিনি বাবরের নির্মমতার আখ্যান গাইতে লাগলেন। হাতে রাবাব নামের বাদ্যযন্ত্রটি। তাঁর মুখনিঃসৃত বাবরের অত্যাচরের কাহিনিই বাবরগাথা নামে পরিচিত।

বাবরের মুঘল সৈন্য এমনাবাদ নগরজুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে তখন। তাদের ঘোড়ার খুরে দলিত হচ্ছে অসহায় মানুষ। প্রজারা যে যেখানে পারছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটছে। হাত পড়েছে নারীদের সম্ভ্রমে। একদিকে নিরীহ নগরবসীদের হাহাকার, অন্যদিকে অত্যাচারী মুঘলসেনাদের পৈশাচিক উল্লাস। চারদিকে লুট-মারের চিহ্ন! আতঙ্কিত পুরুষদের ধরে ধরে লুটের মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে মুঘল সেনারা। সেই সময়ে গুরু নানকদেবও এমনাবাদের রাস্তার ধারে উপস্থিত। নিরীহ মানুষের উপর মুঘলদের এই বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে নানকদেব বলে উঠলেন, ‘সত্য নাম, করতা পুরুষ।’ অর্থাৎ এক ওঙ্কার, এক পরমপুরুষ সত্য ব্রহ্ম। তিনি ওয়াহে গুরুজী। এই প্রবচন শুনে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মুঘল সেনারা। উঁচু কাঁধের বলিষ্ঠ, শক্ত-সামর্থ্য নানকদেবকে দেখে মুঘলসেনারা তাঁকে দিয়ে লুটের মালপত্র বইতে নির্দেশ দিল। নানকদেব অস্বীকার করলেন। বাবরের সৈন্যরা তাঁকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য নগরবাসীর সঙ্গে কয়েদখানায় বন্দি বানালো।

কারাগারের অন্ধকূপ আলোকিত করে কীর্তন গাইতে শুরু করলেন গুরু নানক। তাঁর চারপাশে জ্যোতির্বলয়। কয়েদখানার দারোগা থেকে দ্বাররক্ষী— সবাই ভাবের জোয়ারে ভেসে গেল। নতমস্তকে বসে রইল মহান সাধকের সামনে। খবর পৌঁছালো বাবরের কাছে। মুঘল বাদশা ছুটে গেলেন কয়েদখানায়। নানকদেবের কুঠুরির কাছে পৌঁছে দেখলেন অবাক করা দৃশ্য। তাঁর সেপাই-সান্ত্রীরা নানকদেবের গুরুবাণী শুনছে মুগ্ধ হয়ে!

গুরু নানকের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে আগেই শুনেছিলেন বাবর। এই প্রথম তাঁকে দর্শন করলেন। তাও কিনা নিজের কয়েদখানায় বন্দিরূপে। নানকদেবের সামনে মাথা নোয়ালেন বাবর।

ফ ঃ ২

গুরু নানক বলে উঠলেন, 'সেই অকাল পুরুষকে ধন্যবাদ দিন বাদশাহ!' বাবর ক্ষমাপ্রার্থী চেয়ে বললেন, 'আমার সৈন্যরা আপনার সঙ্গে যে অভব্য আচরণ করেছে সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত।' নানকদেব বললেন, 'ক্ষমা তুমি তাঁর কাছে চাও, যার সৃষ্টিকে তুমি পদদলিত করেছো। নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, আর অকারণে তাঁদের কারাবন্দি করে তুমি যে অন্যায় করেছ, সেই সব কিছুর জন্য তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বাবর নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে নানকদেবকে কথা দিলেন, আর কখনো কোনও নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচার করবেন না।

গুরু নানক বাবরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দরিদ্রকে বিরক্ত করতে নিজের ক্ষমতার প্রয়োগ করো না, বরং তাদের মন জয় করার চেষ্টা করো।' বাবর গুরু নানক-সহ সমস্ত নগরবাসীকে সসম্মানে মুক্তি দিলেন।

বাবর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুঘল বাদশাহ। ১৫১৯ সাল থেকে ১৫২৬ সালের মধ্যে পাঁচবার ভারত আক্রমণ করেন তিনি। শেষ দফার আক্রমণে পানিপথের রণক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয় বাবরের হাতে।

বাবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য আগামীদিনে ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শাসনতন্ত্র, অর্থতন্ত্র, ধর্মীয়, এমনকী সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে— এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন গুরু নানকদেব। এমনাবাদে মুঘলশাসনের শুরুটা চাক্ষুষ করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল নানকদেবের ভবিষ্যদ্‌বাণী।

গুরুগ্রন্থ সাহিবে নানকদেব বলেছেন— 'বাবরবাণী ফিরি গই কুইরু না রোড খাই।' —যার মর্মার্থ, বাবরের সাম্রাজ্য যত বিস্তৃত হচ্ছে অত্যাচারও ততই বাড়ছে। বাবরের নির্দেশে শাহজাদিদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। কাব্যকৃতি 'বাবরগাথা'য় সর্বমোট চার পঙ্‌ক্তিতে গুরুনানকের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও উপদেশ উদ্ধৃত রয়েছে। 'বাবর গাথা'র প্রথম চরণে 'লালো বড়োই' নামে জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, 'হে লালো! বাবর নিজের পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের দেশে ঢুকে পড়েছে, আর জোর জবরদস্তি করে আমাদের ঘরের মেয়েদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে। ধর্ম আর লজ্জা দুইই আজ নিরুদ্দেশ। পাপ, মিথ্যা— এই দোষগুলি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে লালো! আমাদের এই মাতৃভূমিতে রক্তের দাগ লেগেছে। তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুঘলদের স্থায়িত্ব ভারতে বেশিদিন হবে না। ততোদিনে, 'মর্দ কা চেলা' জন্ম নেবে এই ভারতভূমিতে।

এখানে সম্ভবত, ১৫২২ সালে মুঘলদের ভারত আগমন ও ১৫৪১-এ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্‌বাণী নিহিত রয়েছে। আর 'মর্দ কা চেলা' বলা হয়েছে শেরশাহ সুরীকে। শেরশাহ ১৫৩৯ সালে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লিতে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ভারতের প্রথম মুসলমান শাসক ছিলেন, যিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমান নজরে দেখতেন।

কাব্যকৃতির দ্বিতীয় চরণে গুরু নানকদেব লিখেছেন, 'হে ঈশ্বর, ভারতে এখন বাবরের শাসন চলছে, তা সত্ত্বেও খুরাসান প্রদেশ এখনো সুরক্ষিত। কারণ তুমি তার প্রহরী। অথচ বাবরের বর্বরতার আগুনে তুমি নিক্ষেপ করেছো হিন্দুস্তানকে। যমরূপী মুঘলদের দিয়ে ভারত আক্রমণ করিয়েছো তুমি। পরিণামে এত মার-দাঙ্গা হয়েছে যে ভারতবাসী আতঙ্কিত। ঈশ্বর, তুমি কি এতই নির্দয়!

তৃতীয় চরণে নারীদের উপর বাবরের হিংস্রতার বর্ণনা রয়েছে ছত্রে ছত্রে। বলা হয়েছে, ভারতের যে পতিব্রতা নারীদের সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল-জ্বল করতো, তাঁরা আজ মুণ্ডিত মস্তক। এক সময় যারা অন্দরমহলে থাকতেন, মুঘলদের অত্যাচারে সড়কেও তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। স্বামীহীনা, অভুক্ত ভারতীয় রমণীরা স্বামী-সন্তান হারিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

চতুর্থ চরণে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সম্বোধন করে নানকদেব বলেছেন— 'আমি এই জগতের একটা অংশমাত্র যার একমাত্র মালিক তুমি। তুমিই গড়ো আবার তুমিই তার লয় করো। তুমিই সমস্ত কর্মের হোতা। তোমার নির্দেশেই সুখ-দুঃখ আসে আর যায়। এই হিন্দুস্তানের আজ যে দশা চলছে, তার সমাপ্তি হবে শীঘ্রই।

বাবরের ভারত আক্রমণ এবং মুঘলদের অত্যাচারে গুরু নানকদেব কত ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন তা এই কাব্যকৃতি থেকে জানা যায়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে তিনি যথেষ্ট নিরাশ ও হতাশ ছিলেন। কিন্তু সবটাই ঈশ্বরের লীলা মেনে নিয়ে সহ্য করেছিলেন। বাবরগাথায় যেভাবে বাবরের ভারত আক্রমণ ও সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন গুরু নানকদেব, নিঃসন্দেহে তা ভারতের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। □

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

বাংলাদেশে হিন্দুত্ব না থাকলে বাঙ্গালিয়ানাও থাকবে না

তাই সংস্কৃতি রক্ষায় সবাই হোক 'কাণ্ডারী সেনাপতি'

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বাংলাদেশের দিকে তাকালে আজ যত না বাঙ্গলার মহিলা বাঙ্গালিয়ানার অহংকার নিয়ে চর্চা হবে তারচেয়ে ঢের গুণ নিন্দিত সমালোচিত এবং বিচলিত করছে সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠুরতা। হিন্দুর এবং বাঙ্গালিয়ানার সিগনেচার দুর্গা পুজো যখন ভাঙা মূর্তির চিহ্নে মৌলবাদের মরচে ধরা কলঙ্করেখা বহন করে তখন ধর্ম ও অধর্মের দড়ি টানাটানি লড়াই অবধারিত। মৌলবাদ বনাম বাঙ্গালিয়ানার যুদ্ধ চলছে বাংলাদেশে। যে যুদ্ধে বলি হচ্ছে বাংলা ভাষা। ভাঙছে দুর্গা প্রতিমা। ঢাকার একটার পর একটা বনেদি বাড়িতে ঢাকি আর আসে না। শ্যাওলা ধরছে দুর্গা দালানে। সেই শ্যাওলায় পিছলে যাচ্ছে হিন্দু নারীর সম্ভ্রম। উনিশ শতকেই বাঙ্গলার মৌলবিরা বাংলা ভাষাকে 'হিন্দুর ভাষা অথবা কুফুরি জবান অর্থাৎ কাফেরের ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছিল'। একটা সময় ফজলুল হকের পরিবার সহ অনেক মুসলমান পরিবার উর্দুকেই মাতৃভাষা বলে মান্যতা দিয়েছিল। আজ আবার সেই প্রক্রিয়া বাংলাদেশে শুরু। ইসলামিক দেশে বাংলাদেশে জাতিসত্তার অনুসন্ধানে ক্রমাগত আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এই প্রক্রিয়া 'হিন্দুত্ব' বর্জন করে ভাষায় ইসলামীকরণ ঘটাচ্ছে। ভাষার আত্মসম্মান দিয়ে কলম শুরু করলাম কারণ এই সূচক গভীরভাবে আরবি ভাষা যোগে বাংলা ভাষার 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান' ঘটাচ্ছে তা হিংস্র মৌলবাদের কালধ্বনি সূচিত করছে। বাংলাদেশের বাংলার উর্দুকরণ দেখে রবি ঠাকুরের 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা' প্রবন্ধের সেই কথাগুলো মনে পড়ছে—'আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙ্গালি মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হোক না, বাংলা

ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিপীড়িত করলে সেটা আরও বেশি শোচনীয় হবে'। ভাষা জেহাদ যদি আমরা এড়িয়ে যাই তবে তো বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন নিয়ে চর্চা অপূর্ণতা পাবে। বাংলাদেশের যদি বাংলা ভাষার প্রতি সত্যিই দরদ থাকত তবে পত্রিকার নাম 'দৈনিক আজাদ', তীকবীর, ইত্তেফাক, ইনসান ইত্যাদি হতো না। সংগঠনের নাম হতো না 'তমদ্দুন মজলিস'। বাংলাদেশ যেন ভুলে না যায় বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার দাবি কিন্তু এক বাঙ্গালি হিন্দু তুলেছিলেন। তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলাদেশে সেই হিন্দুর পরিণাম কী হলো?

মুক্তি যুদ্ধে নৃশংসভাবে নিহত এবং সব সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি আইনের সুযোগ নিয়ে বাঙ্গলাদেশের মুসলমানরা বেদখল করে নেয়। ভাষা জেহাদ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তত হিন্দু নিধন বাড়ছে বাংলাদেশে। আজ হিন্দু কমতে কমতে আট শতাংশে! এই ছবি যে বাংলাদেশের স্বাভাবিক দৃশ্য হবে তার পূর্বাভাস নব্বইয়ের দশকেই পাওয়া যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, ''এ দেশের মুসলমান এক সময় মুসলমান বাঙ্গালি, তারপর বাঙ্গালি মুসলমান, তারপর বাঙ্গালি হয়েছিল; এখন আবার তারা বাঙ্গালি থেকে বাঙ্গালি মুসলমান, বাঙ্গালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙ্গালি এবং মুসলমান বাঙ্গালি থেকে মুসলমান হচ্ছে''—বাংলাদেশের বুকে প্রতিদিন শাখা বিস্তার করছে মৌলবাদের সাম্রাজ্য যেখানে 'সবিনয়' যতবার বদলে হচ্ছে 'তসলিমবাদ' ততবার বাঙ্গালিয়ানার মৃত্যু হচ্ছে এবং ইসলামের উগ্র সন্ত্রাসী থাবা আঁচড় দিচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীণ হওয়ার কারণগুলো যদি সংক্ষেপে দেখি তবে, আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকাকালীন (১৯৭১--৭৫) বাংলাদেশকে সেকুলার বললেও কর্মকাণ্ডে সে চরিত্র হারাতে থাকে। শেখ মুজিবুর একটা সাক্ষাৎকারে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের এক খিচুরি পরিবেশন করেছিলেন। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের

ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দেবে, কিন্তু নিজে কোনও ধর্মকে কোনওরকম পৃষ্ঠপোষকতা করবে না; ধর্ম কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক থাকবে যার সাথে সরকার বা রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

১৯৭৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠন, মাদ্রাসার শিক্ষা প্রসারে সরকারি উৎসাহ অনুমোদন এবং শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক চরিত্রের আবাহন এক ইসলামিক অসহিষ্ণু বাংলাদেশের পত্তন ঘটায়। মুজিব সরকার 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিল করেনি। ২০০১ এর পর থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের ধারা চলছে বাংলাদেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আবুল বারাকত 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন—১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। নিরাপত্তাহীনতায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত বাংলাদেশের হিন্দুরা। যদি কেবলমাত্র গতবছর, ২০২০-র দিকে তাকাই তবে কেবলমাত্র মে মাসেই মন্দির, প্রতিমা ভাঙচুর, হামলা, ভিটেমাটি দখল খুন, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ৭৫টি ঘটনা ঘটেছিল। ওই মাসেই গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়া উপজেলার লাখিপাড়া গ্রামে সামান্য বেলগাছের ডাল ভাঙাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলে। এই একটা ছোট্ট গ্রামে ২৫ দিনে তিন বার হামলা চলেছিল। নেত্রকোনার বাজার কালী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর বা সন্ত্রাসী ফরহাদের নেতৃত্বে বলপূর্বক সীতাকুণ্ডে চিত্তরঞ্জনের বসতবাড়ি দখলের চেষ্টা এবং বাধা দিলে তার দুই কন্যাকে আক্রমণ—এমন টুকরো টুকরো ৭৫টি ঘটনা ঘটেছিল এই মে মাসেই। এমনকী হিন্দুদের হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসাটাও মেলে না। যে ঘটনা ঘটেছিল আসগর আলী হাসপাতালে অশোক কুমার দাসের। চরম চিকিৎসা অবহেলা এবং মৃত্যু

সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেয়নি। এবার দুর্গা পূজোয় যেভাবে প্রতিমা ভাঙচুর এবং হিন্দু হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে তাতে বাঙ্গালি হিসেবে লজ্জাবোধ করছি। বাংলাদেশ সেকুলার বাঙ্গালির নাকি মৌলবাদী বাঙ্গালির তা এখন বড়ো জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশ কি সত্যিই আর দুর্গাপূজোর ধর্ম নিরপেক্ষ উৎসবমুখর পেটুক বাঙ্গালিয়ানার চালচিত্র উপহার দিতে পারবে নাকি তা এক গল্প হয়েই থেকে যাবে? এত যন্ত্রণা অবহেলার পরেও ইতিবাচক এক টুকরো ঘটনা চোখ এড়ায়নি। ঢাকার রমনা কালীমন্দিরের দুর্গাপুজোর দায়িত্বে এবার প্রমিলারা। ওদেশে যখন হিন্দু মেয়েরা লাঞ্ছিত ধর্মান্তরিত তার মধ্যেও এই একটুকরো ব্যতিক্রম যেন মনে করায় দশভুজা এখনও আছে বাংলাদেশে। বজ্রমন্দিত শব্দ ঘোষিত হবে কিনা জানি না কিন্তু বাংলাদেশের বাঙ্গালি যেন ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে নিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের মতো মৌলবাদের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিটা বাঙ্গালি যেন নিরলস বাঙ্গালি সংস্কৃতির ললিত সিংহ হয়ে ওঠে। যদি হিন্দুত্ব না টেকে তবে বাঙ্গালিয়ানাও কিন্তু বাংলাদেশে টিকবে না। তাই সংস্কৃতি রক্ষায় সবাই হোক 'কাণ্ডারী সেনাপতি'। ◻

আট বছরে ৩৬০০ বার আক্রান্ত হিন্দুরা

ড্যাশে উইলি পৃথিবী বিখ্যাত মানবাধিকার সংগঠন। এই সংস্থার অধীনে কাজ করে আইন ও সালিশি কেন্দ্র নামের একটি সংগঠন। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ৩৬০০ বার আক্রমণ হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। আইন ও সালিশি কেন্দ্রের সমীক্ষায় উঠে এসেছে হাড়হিম করে দেওয়া কিছু তথ্য। গত আট বছর হিন্দুদের ৫৫০টি বাড়ি ও ৪৪০টি দোকান ধ্বংস করেছে জিহাদি মুসলমানেরা। হিন্দু মন্দির, দেব-দেবীর মূর্তি এবং ধর্মস্থান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ১,৬৭০ টিরও বেশি। এইসব ঘটনায় বিভিন্ন হিন্দু পরিবারের ১১ জন সদস্য খুন হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন ৮৬২ জন। অসংখ্য মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। রাণা দাশগুপ্ত বলেন, 'যদিও হিন্দুরা ১৯৯০ এবং ২০০০ সালে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১১-র পর থেকে হিন্দুদের ওপর হামলা বাংলাদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা খুবই বিপজ্জনক।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আশা করেছিলাম এবার হিন্দুরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি।' বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা এখন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ। অথচ মাত্র চল্লিশ বছর আগেও সংখ্যাটা ছিল ১৩.৫ শতাংশ। সরকারি সমীক্ষাতে উঠে এসছে এই তথ্য। গত আট বছরে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের একটা সাধারণ পদ্ধতিও চোখে পড়েছে সকলের। প্রথমে ফেসবুকে ইসলামের নামে আপত্তিকর কিছু একটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর কিছু জিহাদি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি 'ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে' বলে চিৎকার জুড়ে দেন। সব শেষে হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জিহাদিরা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকেই মৌলবাদের নিন্দা করেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেন না।

আত্মত্যাগ ছাড়া রাজনৈতিক লড়াইয়ে শাশ্বত জয় অসম্ভব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভারতবাসীর কাছে স্বরাজ সাধনার ধারাকে বাস্তবতার পথে প্রবাহিত করলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র ও অরবিন্দের চেতনায় স্বরাজের ভিন্নতর ধারাকে সমন্বয় করে বাস্তবের মাটিতে নামলো স্বরাজ্য ভাবনা, তার মহারথী সুভাষ। বঙ্কিম-মানসে ছিল অখণ্ড -জাতির ভাবনা আর অসুর বিনাশের যজ্ঞ, সাহিত্য-স্বরাজ। স্বামী বিবেকানন্দে প্রতিভাত হলো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বরাজ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ধারার মধ্যে মুক্তি পেল ভারতবর্ষের অখণ্ড চেতনার রূপ-রস-গন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সুরে ভারতবীণায় বেঁধে দিলেন রাজনৈতিক স্বরাজবোধ। এই সকল পথের অমোচ্য সংগীতে শুরু হলো স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যুদ্ধ; সুভাষ তার মহাধিনায়ক। বিশ্বের সকল ঘটনাকে বাস্তবতার লাশকাটা ঘরে কাটাছেঁড়া করে, তিনি শত্রু-মিত্র জটিলতাকে সহজ সরল রূপ দিলেন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যার অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশবিরোধী শক্তি তাঁকে নানান গালমন্দে ভূষিত করল; খসে পড়ল নানান ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক মুখোশ। কিন্তু নেতাজী অনন্য; আত্মত্যাগ ছাড়া যে রাজনীতির লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা তিনি ভারতবাসীকে এবং ভারতের রাজনীতিবেত্তাদের বুঝিয়ে দিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই; পরগাছা থেকে মুক্তি নেই ভারতবর্ষের।

আজাদ হিন্দের অভিমুখে ঃ সালতামামি

১৯৪১, ১৮ জানুয়ারি—গভীর রাতে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার এলগিন রোডের বাসগৃহ ত্যাগ করে পেশোয়ার অভিমুখী হলেন, সহায়তা করলেন ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির কুমার বসু। পরে সেখান থেকে ভগৎ রাম তলোয়ারের সাহচর্যে কাবুল পৌঁছন।

২৬ জানুয়ারি—কাবুল থেকে ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় রাশিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন সুভাষ।

মার্চ—মস্কো থেকে জার্মানির বার্লিনে এলেন; প্রবাসী ভারতীয় দেশপ্রেমিক এ.সি.এন.নাম্বিয়ার, গণপুলে, ড. গিরিজা মুখার্জি, প্রমোদ সেনগুপ্ত, এম.ভি.রাও, ডা. মল্লিক, কান্তারাম প্রমুখ তার সহায়ক হলেন, গঠিত হলো Free Indian Center (মুক্ত ভারতীয় কেন্দ্র বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ) এবং পরে তৈরি হলো সাড়ে চার হাজার সেনায় গঠিত Indian Legion. জার্মান

স্পনসরশিপে আজাদ হিন্দ রেডিয়োর সঙ্গে যুক্ত হলেন তিনি।

২ নভেম্বর---আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তিনটি বিখ্যাত কথার জন্ম হয়—জয় হিন্দ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ ও নেতাজী।

এদিকে জেনারেল রোমেলের হাতে আফ্রিকার যুদ্ধবন্দি ১০ হাজার সৈনিককে জার্মানিতে আনা হয়েছিল। তাদের ভেতর থেকে ১৪ জনকে বেছে নিলেন সুভাষ। এদের নিয়েই তৈরি হয়েছিল Indian Legion. এক বছরের মধ্যেই তা অনেক বেড়ে গেল।

সুভাষের জার্মানি অবস্থান ১৯৪১ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি। এরমধ্যে ১৯৪১ সালের মে মাসে সাক্ষাৎ করেছিলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফম্ রিবেন্ট্রপের সঙ্গে। ১৯৪২ সালের ২৯ মে হিটলারের সঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

১৯৪২, ৯ মার্চ—সিঙ্গাপুরে থাইল্যান্ড ও মালয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা হয়। সভাপতিত্বে ছিলেন পেনাঙের ব্যারিস্টার এ. রাঘবন।

১৯৪২ সালের ২৮--৩০ মার্চ—টোকিয়োতে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ডাকে এবং সভাপতিত্বে জাপান, চিন, মালয় ও শ্যামদেশের বহু ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থির হয়, প্রবাসী ভারতীয়দের 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' নামে সরকারি দল এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি সেনাবাহিনী গঠিত হবে।

১৯৪২, ২০–২৩ জুন—লিগের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় প্রবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ব্যাঙ্ককে। এখানে জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, হংকং, বর্মা, মালয়, শ্যামদেশ থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেন। উপস্থিত হলেন জাপান অধিকৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দি শিবিরের প্রতিনিধিরা।

২২ জুন তৈরি হয়ে গেল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ। ঠিক হলো লিগের সশস্ত্র শাখা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর আধিপত্য থাকবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট Council of Action বা সমর পরিষদের উপর। পরিষদের আন্তর্বর্তীকালীন প্রথম সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু। অন্য সভ্যরা হলেন—এন. রাঘবন, কে.পি.কে. মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ এবং কর্নেল জি. কিউ. গিলানি। ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হলো। ঠিক হলো, সুভাষচন্দ্র বসুকে বার্লিন থেকে এশিয়ায় আসার অনুরোধ করা হবে।

এর পরেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে যে স্থানে ভারতীয়রা রয়েছেন, সেখানে লিগের বহু শাখা খোলা হল। বহু সিভিলিয়ান লিগের সভ্য হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য মোহন সিংহের নেতৃত্বে ভারতীয় বন্দি শিবির থেকে বহু ভারতীয় সেনাদলে যোগদান করলেন। তাদের সামরিক শিক্ষা শুরু হল। পেনাঙে খোলা হলো 'স্বরাজ ইন্সটিটিউট' নামে একটি শিক্ষা শিবির, লিগের সদস্য যুবকেরা সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন।

১৯৪৩, ৯ ফেব্রুয়ারি---জার্মানির কিয়েলা বন্দর থেকে সাবমেরিন যাত্রা শুরু করলেন সুভাষ, উদ্দেশ্য জাপান, সঙ্গী হলেন আবিদ হোসেন।

৬ মে---সুমাত্রার সাবান বন্দরে পৌঁছালেন সুভাষ। পথে মাদাগাস্কারের কাছে জার্মান থেকে জাপানি সাবমেরিন বদল করতে হলো।

১৯৪৫, ২৩ আগস্ট—জাপান রেডিয়ো থেকে সরকারিভাবে প্রচারিত হলো নেতাজির মৃত্যুসংবাদ, যে ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটেছে নেতাজীর। মেনে নিলেন না কোটি কোটি ভারতবাসী, তাঁর ভক্ত ও অনুগামীরা। আর এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল আজাদ হিন্দ সরকারের। এই শেষের ইতিহাস এখনও আমাদের অধরা।

১৬ মে---বিমান যোগে টোকিয়ো উপস্থিত হলেন সুভাষ।

১০ জুন---জাপানি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজোর সঙ্গে দেখা হলো।

২১ জুন—টোকিও থেকে সুভাষের বেতার বার্তা শোনা গেল।

২ জুলাই---সুভাষ বিমান যোগে সিঙ্গাপুরের সোনানে উপস্থিত হলে, সংবর্ধনা দিতে বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হলেন বহু স্বাধীনতাকামী ভারতীয়।

৪ জুলাই—সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলের প্রকাশ্য সভায় রাসবিহারী বসু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষের হাতে তুলে দিলেন। ফৌজের শীর্ষ সমরনায়ক জে. কে. ভোঁসলে নেতাজির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন।

৫ জুলাই—সোনানের টাউন হলের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হলো, সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন নেতাজি।

৬ জুলাই---জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো আজাদ হিন্দ ফৌজকে

সম্মান প্রদর্শন করলেন; উচ্চমঞ্চে তোজো ও নেতাজি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন; নেতাজী দেড়ঘণ্টা ভাষণ দিলেন।

৯ জুলাই—পাডাঙ্গে নেতাজীর সভায় এক লক্ষের বেশি ভারতীয় অংশগ্রহণ করলেন। নেতাজী উত্তেজক দীর্ঘ বক্তব্যে জানালেন তিনি কেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছেন, আর কেনই বা জার্মানি থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ না চালিয়ে বিপদসংকুল পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাপানে এলেন।

১৫ আগস্ট---প্রায় তিরিশ হাজার ভারতীয়ের উপস্থিতিতে ফেয়ারার পার্কে একটি সভায় নেতাজি বক্তৃতা দিলেন। ঘোষণা করলেন নবগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদল বর্মা থেকে ভারতের দিকে প্রবেশ করে মাতৃভূমি বিদেশি মুক্ত করবে।

২৫ আগস্ট—নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহসালার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করলেন।

১৯৪৩, ২১ অক্টোবর—বেলা সাড়ে দশটায় ডাই তোয়া গেকিজোতে পূর্ব এশিয়ার সকল স্থানে কার্যকরী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে অনুষ্ঠিত হলো সভা; প্রতিষ্ঠা হল আজাদ হিন্দ সরকারের; বিদেশে প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার। নেতাজী দেড় ঘণ্টার বক্তৃতার পর সর্বাধিনায়করূপে শপথ গ্রহণ করলেন, স্লোগান দিলেন 'দিল্লি চলো'। সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলেন রাসবিহারী বসু।

আজাদ হিন্দ সরকারের পদাধিকারীরা

সুভাষ চন্দ্র বসু—প্রধানমন্ত্রী (সমর ও বৈদেশিক বিভাগ)

ক্যাপ্টেন ড. লক্ষ্মী স্বামীনাথন—মহিলা সংগঠন

এস. এ. আয়ার—বেতার, সম্প্রচার ও প্রকাশনা

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী-অর্থ

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ আহমদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এন. এস ভগত, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে. কে. ভোঁসলে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিংহ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. জেড কিয়ানি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ. ডি লোগাস্থন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইসান কাদের, লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহ নওয়াজ খান (নেতাজীর বিরুদ্ধে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী, যে আজাত হিন্দ ফৌজের গচ্ছিত সম্পদ লুণ্ঠনে জওহরলাল নেহরুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত করার বদলে স্বাধীন ভারতে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিল ও বলিউডের চটুল অভিনেতা শাহরুখ খানের দাদু।)

এ. এন. সহায়—সেক্রেটারি

রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা।

২২ অক্টোবর—মহিলা ব্রিগেড ঝাঁসির রানি বাহিনীর উদ্বোধন হলো। বাহিনীর প্রধান নেতৃত্বে এলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রথমে হলো ৫০০।

২৩ অক্টোবর—এই অস্থায়ী সরকারকে স্বাধীন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দিল জাপান। এরপর স্বীকৃতি এলো জার্মানি, ইতালির। পরে চীন, মানচুকু, ফিলিপাইন, শ্যামদেশ ও বর্মাও মেন নিল তার স্বাধীন রাষ্ট্র-চেতনা। আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী নেতা ভি. ভ্যালেরার শুভেচ্ছা ও সমর্থন বার্তাও পেলেন নেতাজী, সেইসঙ্গে সিস্টার নিবেদিতার ভারত আগমনের উদ্দেশ্যে-বৃত্তও সম্পূর্ণ হলো।

২৫ অক্টোবর—রাত বারোটা ৫ মিনিটে বেতারে আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

নভেম্বর প্রথম—স্বাধীন সরকার গঠিত হলেও তার ভৌম-অস্তিত্ব ছিল না। জাপান কর্তৃক যুদ্ধে জয়লাভ করা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ আজাদ হিন্দ সরকারকে দান করলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো। দ্বীপদুটির নতুন নামকরণ হল শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

১৯৪৪, ৪ ফেব্রুয়ারি---ফৌজের আক্রমণে আরাকান থেকে পাওয়া গেল প্রথম যুদ্ধজয়ের সংবাদ।

১৮ মার্চ ---ফৌজ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল।

৮ এপ্রিল—ফৌজ কোহিমা দখল করল।

১৪ এপ্রিল—মৈরাং আর বিষেণপুর ব্রিটিশ আধিপত্য মুক্ত হলো।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহ---বর্ষা নামল উত্তর-পূর্ব ভারতের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে; ভারী বৃষ্টির ফলে মান্দালয় থেকে ইম্ফল পর্যন্ত সাপ্লাই লাইন ভেঙে পড়ল। দেখা গেল খাদ্য ও ওযুধপত্রের তীব্র অভাব; সঙ্গে জুড়ল পোকামাকড়, হিংস্র জোঁক ও সরীসৃপের উৎপাত। ব্রিটিশ তৎপরতা ও সেনা মোতয়েনও বাড়ল; কাজেই বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। ময়রাং, বিশেষপুর, ইম্ফল পরিত্যক্ত হলো।

জুলাই—আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৭ হাজার সেনার প্রাণ গেল। এরপর জাপান বাহিনীর ক্রমাগত ব্যর্থতায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন জেনারেল তোজো।

১৯৪৫, ২১ জানুয়ারি—মৃত্যু হলো মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর। বাহিনী মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়ল।

২৪ এপ্রিল—যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বুঝে এবং সহকর্মীদের অনুরোধে নেতাজী ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

৩ মে—রেঙ্গুন এল মিত্রশক্তির দখলে; বর্মার যুদ্ধে পরাজয় ঘটল ফৌজের, বন্দি হলেন বিশিষ্ট ফৌজ সেনা ও সেনাপতি।

১৬ আগস্ট---সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে বিমানে সায়গন চলে গেলেন নেতাজি; সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গেলেন মেজর জেনারেল কিয়ানিকে।

১৮ আগস্ট---জানা যায়, নেতাজি সায়গন থেকে দালাত ও তুরাণ হয়ে ফরমোজার তাইহোকু বিমানবন্দরে পৌঁছালেন, সঙ্গী কর্নেল হবিবুর রহমান। এরপরের ইতিহাস রহস্যাবৃত। বিতর্কিত ও অমীমাংসিত।

১৯৪৫, ২৩ আগস্ট—জাপান রেডিয়ো থেকে সরকারিভাবে প্রচারিত হলো নেতাজির মৃত্যুসংবাদ, যে ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটেছে নেতাজীর। মেনে নিলেন না কোটি কোটি ভারতবাসী, তাঁর ভক্ত ও অনুগামীরা। আর এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল আজাদ হিন্দ সরকারের। এই শেষের ইতিহাস এখনও আমাদের অধরা।

(আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে)

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসের অবলুপ্তি কি অবশ্যম্ভাবী

অন্যান্য প্রদেশের প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, এই পশ্চিমবঙ্গেই বসবাসকারী বাঙ্গালিদের মধ্যে কতজন দু' চারটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারেন? উত্তরটা খুবই শক্ত। কারণ উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত কেউই আজকাল দু'চারটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারেন না। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ তো আজকাল বাংলা হয়ে গেছে। যেমন কাপ, প্লেট, রবার, পেন্সিল, পেন ইত্যাদি। আর উচ্চবিত্ত এবং তথাকথিত সেলিব্রেটিরাও বাংলা কথা বলার সময়ও দু' চারটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করতে পারলে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। অর্থাৎ নিজের এলেমটা ঠিকমতো জাহির করতে পারেন না। আর উচ্চবিত্তদের কথা যতটা কম বলা যায় ততটাই মঙ্গল। তাদের মা হয়েছে মম, বাবা হয়েছে ড্যাড, আর মহিলারা সবাই আন্টি। বিরক্তি প্রকাশ করতে কথায় কথায় 'মাই ফুট' একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। হ্যাঁ, সাহেবরা তাই করে থাকে, তাই। বর্তমানে বাঙ্গালিরা আর সাহেবদের অনুকরণ করে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকজন যা করে থাকে তাই করে। বাঙ্গালির রান্নাঘরে আজকাল আর পোলাও রান্না হয় না। দোকান থেকে বিরিয়ানি, কাবাব আর আনুষঙ্গিক খাদ্য সম্ভার আসে। বাড়িতে ঘণ্ট, ডালনা, ছেঁচকি, তেলকৈ, ভাপা প্রভৃতি আর রান্না হয় না।

এতদিন জানা ছিল কারিপাতা দক্ষিণ ভারতেই চলে। এখন বাঙ্গালির রান্নাঘরে কারিপাতা পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছে। মিষ্টির দোকানে স্থান করে নিয়েছে দহিবড়া, ধোকলা প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী। বিয়েবাড়িতে ফুচকা খাওয়া বা খাওয়ানোটা অতি আবশ্যিক। যে কোনও অনুষ্ঠানে, বিয়েবাড়ি হোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পূজামণ্ডপ সর্বত্রই হিন্দি সিনেমার হিট গানের রমরমা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকা বাঙ্গালি, শ্রোত্রীবর্গও বাঙ্গালি, কিন্তু চলছে হিন্দি সিনেমার গান। শ্রোত্রীবর্গও সেগুলি উপভোগ করছেন। পশ্চিমবঙ্গেই বাংলামাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন আর নার্সারি স্কুল। উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেকে তো আবার গর্ব করে বলে থাকেন, 'আমার ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তো তাই বাংলাটা ওর তেমন আসে না।' পশ্চিমবঙ্গে বাস করেও ছেলে বাংলায় কথা বলতে পারে না এটা কতই না গর্বের বিষয়! সব থেকে আশ্চর্যের, বাঙ্গালিদের বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের বাঙ্গালিদের পোশাক পরিচ্ছদেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ললনাগণ কে কতটা নিজেকে অনাবৃতা রাখতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। আইনের অনুশাসন না থাকলে হয়তো বিষয়টা অন্যদিকে গড়াতো।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল শুধু একাই তো নন

ভারতের ইতিহাসে স্বধর্মনিধনের নায়েকের অভাব হয়নি। যুগ যুগ ধরে এ ধারার আত্মহননকারী ব্যক্তির সমাহার দেখা গেছে এই ভারতে। আজ অবশ্য এ ধরনের কুলাঙ্গারের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি আধুনিকীকরণও হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায় যেমন, মিরজাফর, তেমনিভাবে, জয়চাঁদ থেকে শুরু করে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ, অমরকোর্টের রাণা অর্জুন সিংহও একই পথের পথিক। শুধু কী তাই, তৎকালীন সময়ের মাগুরার এমপি নিতাই চৌধুরী, গয়েশ্বর রায় বা বলধা গার্ডেনের হিন্দু জমিদাররাও একই পথের পথিক। একটু যদি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, অসমের বরদলৈ মন্ত্রীসভার সদস্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসন্ত কুমার দাস (যার সিলেটে পঞ্চাশ বিঘার বেশি জমির উপর বাড়ি ছিল) বা আর এক মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও।

আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায়ের স্বগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কাজকর্মও কম দায়ী নয়। ঠিক তেমনি ভাবে রংপুরের সংরক্ষিত কেন্দ্রের এমএলএ তথা ক্ষত্রিয় সমিতির নেতা নগেন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের প্রেমহরি বর্মণরাও দেশ বিভাজনের সময় ভোটাভুটিতে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল শুধুই নয়, এলাকায় দলিতদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে ভুল বুঝিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য মরণপণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। আবার কোচবিহারের হিতসাধিনী সভার একাংশ পাকিস্তানপন্থী হয়ে যায়। তবে এটাও ঠিক যে, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী, খ্যাতিমান আইনজীবী তথা ব্যারিস্টার ও দলিত হিন্দু সমাজের নেতা, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এগুলি ইতিহাসের কলঙ্কিত দিক। ঠিক তেমনি ভাবে অখণ্ড বাঙ্গলাকে স্বাধীন দেশের নাম করে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে যারা চেষ্টা করেছিল, চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় এই বাঙ্গলার মানুষজন রক্ষা পায়, তারা হলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় থেকে যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ।

তবে এটাও ঠিক যে, এদের সেদিনকার ভাবনা চিন্তায় জল ঢেলে দিয়েছিল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, সূর্যকুমার বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টায়। আজ আমরা এই পশ্চিমবঙ্গে যে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর ধরে বসবাস করতে পারছি,

ফঃ ৩

তা এদেরই প্রচেষ্টার ফসল। তবে এটাও ঠিক যে, বর্তমানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পন্থী রাজনীতিবিদদের যে রূপ-পরম্পরা বাড়ছে, তাতে এই বাঙ্গলায় চল্লিশের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক বিপর্যয়

অধ্যাপক Arnold Toynbee প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী মানব সভ্যতার মর্মস্থলে ধর্মের বা Religion-এর অস্তিত্ব বর্তমান। স্বভাবতই ধর্মের অস্তিত্ব বা ধর্মের ব্যর্থতা মানব সভ্যতাকে বহুলাংশে বিপন্ন করে তোলে। মানুষের ব্যক্তি জীবনের অনেকাংশ জুড়ে ধর্মের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে বর্তমান। ধর্মের উন্মেষ মানব জীবনের অপূর্ণতার জ্বালা দূর করে এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলে। ধর্মের এই ভূমিকা বিশিষ্ট ও ব্যাপক। বস্তুত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা বা মানুষের সমগ্র সমাজ জীবনের উপর ধর্মের প্রভাব বিরাজমান। ধর্মবোধের সঙ্গে মানুষের সামাজিক তার সম্পর্ক বিশেষভাব গভীর।

বর্তমান মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাবে ও প্রগতিশীল মনন-চিন্তনে ধর্মীয় সংস্কার আবশ্যক হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় সকল দেশই একাধিক বা বহু ধর্ম বিশ্বাসী লোক বসবাস করে থাকে। সেক্ষেত্রে একটা সমন্বয় সাধন মানবিক ভাবেই এসে যায়। তাছাড়া বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে এবং বিকাশশীল রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে থাকে। এই বিভিন্ন ধর্মের সহবস্থানে সৌহার্দ্য ও সম্প্রতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির বস্তুত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

ইংরেজি 'সেকুলার' শব্দটি বেশ পুরোনো, খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের ও ভাষার জাতক। সেকুলারিজমের ধারণাটা প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তত্ত্বগতভাবে 'সেকুলারিজম' অভিধান মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, এই অর্থে ইহলোকে জাগতিক কল্যাণ প্রয়োগ, দ্বিতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় 'সেকুলার' হওয়া উচিত। ভারতীয়রা আহরণ করলেও খোদ ইংরেজদের দেশেও পূর্ণতম মর্যাদায় পৌঁছায়নি।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে 'সেকুলারিজম'-এর মূলগত অর্থ শুধু প্রতীকী চেহারা দিয়েছিল। সামাজিক ভাবে কল্যাণকর সমাজ গঠনে সাম্যতার ও রাজনৈতিক ভাবে সাম্যতার রূপ, গণতান্ত্রিক মর্যাদা দেয়নি। বরং রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ স্বার্থে বিকৃত ভাবে ব্যবহার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে প্রাণীপ্রেমীদের প্রস্তাব গোহত্যা বন্ধ হোক। ধর্মীয়ভাবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রস্তাব গোহত্যা বন্ধ হোক। সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রস্তাব গোহত্যা বন্ধ হবে না।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ। পূর্ণ বাক্স্বাধীনতা বর্তমান। বর্তমানে রাজনীতির চক্রের ফাঁদে পড়ে বিদ্বজ্জনরা গোখাদকের মৃত্যুর কারণে মোমবাতি প্রজ্বলিত মিছিল করেন, আবার গোরক্ষকের মৃত্যুতে মোমবাতি প্রজ্বলনে বিমুখ থাকছেন। আবার বলা হচ্ছে বিদ্যালয় মাঠে নামাজ চলবে, বিদ্যালয়গৃহে সরস্বতী পূজা চলবে না। এভাবে বৃহত্তর জনসংখ্যার ধর্মীয় উৎসবকে আঘাত হানছে।

অধুনা বাংলাদেশে দুর্গা পূজায় প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নারী নির্যাতনের নির্মম দৃশ্য দেখে বিশ্ববাসী হতবাক হয়েছেন। বলা যায় এদেশে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার জন্য অনেকটাই দায়ী। যেমন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক স্বার্থে বলা হচ্ছে দুধেল গোরুর লাথি খাওয়া ভালো। এবারের বিধান সভা নির্বাচনী সভায় ভাষণে বলা হলো আমরা ভোটে জিতলে পূজা বন্ধ করে দিব। ভারত প্রায় ১১০ কোটি হিন্দু জনসংখ্যার দেশ। এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলিকে হিন্দু নির্যাতনে ইন্ধন জুগিয়েছে, প্ররোচিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে কংগ্রেস শাসনকালে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে জন্ম দিতে ভারতের সৈন্যক্ষয় অর্থ ব্যয়, সীমান্তবর্তী ভারতীয় জনগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা সব ভুলে গিয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুজিব পরিবারের দেশে অবস্থিত শিশু পর্যন্ত হত্যা কর ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে সরকারিধর্ম ইসলাম করা হয়েছে। সে সময় বাংলাদেশের অমুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৯ শতাংশ, বর্তমানে ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখলে দেখবো, বিষয়টি ভারত বিভাজনে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের বিপর্যয়।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
৮প্রথমখণ্ড, শিয়ালদহ, সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২।

বাজিতে ডিগবাজি

আতশবাজি নিষিদ্ধ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এবার পশ্চিমবঙ্গে আতশবাজির সেই বিচ্ছুরণ হলো না। কতকটা দায়সারা ভাবে শেষ হলো এবার দীপাবলি। বাজি ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনে যদি এই ইচ্ছেই থেকে থাকে তাহলে সেটা তারা আগে বলতে পারতেন। তাতে বাজি ব্যবসায়ীরা এতটা ক্ষতির মুখে পড়তেন না। শেষে সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। মুসলমানদের কোনও উৎসবে যদি বাজি ফাটানোর ঐতিহ্য থাকত তাহলে কি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারতেন?

—**শুভময় ঘোষ,**
পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

মাতৃভাষার সংরক্ষণে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম

সুতপা বসাক ভড়

সহজ সরলভাবে মাতৃভাষা বলতে মায়ের মুখের ভাষাকেই আমাদের মনে পড়ে। আমরা জানি, একটি শিশু মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে তার মায়ের গলার আওয়াজ প্রথমে শোনে, তারপর চিনতে পারে। ভূমিষ্ঠ হবার পরে, সে তার মায়ের কাছে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এর একটি অন্যতম কারণ হলো তার গর্ভধারিণীর কণ্ঠস্বর, অস্তিত্ব তার বড়ো পরিচিত মনে হয়। শিশুটি ধীর ধীরে বড়ো হয়— তার মায়ের মুখের কথা, স্নেহ ইত্যাদির মাধ্যমে। আমরা দেখি জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই সে তার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার অথবা বোঝাবার চেষ্টা করে। সেই আপাত দুর্বোধ্য ভাষাটি হলা সন্তান ও মা'র মধ্যকার ভাষা—মনের ভাব প্রকাশের ভাষা। এর কয়েকমাস পরে শিশুটি মা'র কথা বা নির্দেশ পালন করতে আরম্ভ করে। যেমন— আলো, শব্দ, খাওয়া, নানান পরিচয়, নানান জিনিসের সঙ্গে সে পরিচিত হতে থাকে মা'র মুখনিঃসৃত ভাষার মাধ্যমে। এই সময় মা ও মাতৃস্থানীয়া যাঁরা বাড়িতে থাকেন, তাঁদের ওপর একটি আপাতলঘু কিন্তু গুরুদায়িত্ব এসে যায়। শিশুটিকে সূর্য দেখিয়ে কী শেখাবেন? —সান, না সুযিমামা? চাঁদকে মুন, না চাঁদমামা?

একটি প্রবণতা কয়েকদশক ধরে সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের কাছ থেকে মাতৃভাষার শব্দগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি, নিদেনপক্ষে অন্য ভাষা শেখানো হচ্ছে। মাতৃভাষার শব্দগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে অপসরণ করে বিদেশি ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ করে চলেছি, তার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে— বাবা (পাপা, ড্যাড); মা (মাম্মা, মম্); কাকু, মামা, মেসোমশাই, পিসেমশাই (আঙ্কল); কাকিমা, পিসিমা, মাসিমা, মামিমা (আন্টি); গোরু (কাউ); কুকুর (ডগি) ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারে জানার কয়েকটি সহজ উপায় হলো বাচ্চাদের বিদ্যালয়ের সামনে একটু ঘোরাফেরা করা, কিংবা চিড়িয়াখানায় বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের মা-বাবার কথোপকথন, রেস্তোরায় একটু বসা, ট্রেনে সহযাত্রীরূপে ভ্রমণ ইত্যাদি।

এখন সমস্যাটি আপাত নিরীহ হলেও এর বিষময় ফল আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। পাঠ্যপুস্তকে আমাদের পড়ানো হয়েছে— 'ভাষা হলো আমাদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম'। বাস্তবে ভাষার পরিসীমা অনেকগুণ বড়ো। ভাষা হলো একটি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। একটি নির্দিষ্ট ভাষা, একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি সংস্কৃতি প্রতিনিধিত্ব করে একটি সমাজকে, একটি জনগোষ্ঠীকে, একটি ভূ-খণ্ডকে। তখন একটি ভূখণ্ড পরিণত হয় দেশমাতৃকায়।

মাতৃভাষা রক্ষার জন্য ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছে পশ্চিমের কিছু দেশ। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনের থেকে নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য তারা এই ধরনের প্রয়াস করেছে। বেশিরভাগ ভারতীয় ভাষার জননী হলো সংস্কৃত। বাংলা ভাষার বেশিরভাগ শব্দ সংস্কৃতের তৎসম বা তদ্ভব রূপ। তবে সময়ানুক্রমে অনেক বিদেশি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তখন বাংলা ভাষার স্বকীয়তা বজায় রেখে, সেগুলিকে বিদেশি শব্দরূপে চিহ্নিত করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অথচ, বর্তমানে দেখছি ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন সংস্কৃতি, বিজাতীয় গোষ্ঠীর ইচ্ছাকৃত শব্দ অবারিত প্রবেশ ঘটে চলেছে— যা একটি ভয়ংকর ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এই প্রবৃত্তি বা দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে নিজ ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দেশকে রক্ষার জন্য প্রতিবদ্ধ হতে হবে। আমরা যেন 'ও মাই গড', 'ইয়া আল্লার' মতো অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় বিদেশি শব্দের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে 'হে ভগবান' বলতে পারি।

মাতৃভাষা হলো আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মাতৃ ভাষার সংরক্ষণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরা মাতৃভাষার প্রতি সযত্ন হলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও প্রবাহিত হবে স্ব-ভাষা, স্ব-সংস্কৃতি। ▯

হ্যান্ড স্যানিটাইজারের আবিষ্কারক এক অখ্যাত নার্স

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ইংরেজিতে এক প্রবাদ বাক্য আছে— ‘প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর’ অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’ ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করার কথা বলেছে। সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ ছাড়া হাত পরিষ্কার করার এক উত্তম উপায় হলো হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার। তাই এখন এই বিশেষ মেডিক্যাল দ্রব্যের আকাশছোঁয়া চাহিদা রয়েছে। ৮ থেকে ৮০ প্রায় সবাই এই দ্রব্যের সঙ্গে অতিপরিচিত হয়ে গেছে। তবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের আবিষ্কারকের নাম নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ২০১২ সালে ব্রিটেনের বিখ্যাত ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় বেরোনো এক প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের আবিষ্কারক হলেন লুপি হার্নান্ডেজ নামক লাতিন আমেরিকায় জন্ম নেওয়া এক অখ্যাত নার্স। আরও জানা যায় যে ১৯৬৬ সালে নিউ বেকারসফিল্ড শহরে নার্সিংয়ের ছাত্রী ছিলেন লুপি। তিনিই প্রথম হ্যান্ড স্যানিটাইজরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কারণ হাসপাতালে চটজলদি সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা বেশ ঝক্কির ব্যাপার ছিল। তিনি সাবানের বিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করেন অ্যালকোহল থাকা থকথকে জেলকে। ওই বছরেই সব পরীক্ষা- নিরীক্ষায় সফল হয়ে তিনি তৈরি করে ফেলেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার। তিনি বুঝলেন, মানুষের উপকারের জন্য এই মূল্যবান তরলের উৎপাদন এবং একে বাজারজাত করা দরকার। এরপর টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন সংস্থার খোঁজ পান, যারা পেটেন্টের ব্যাপারে সাহায্য করে। এই সংস্থার বিষয়, লুপি হার্নান্ডেজের সম্বন্ধে এর থেকে বেশি জানা যায়নি।

আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে লুপি হার্নান্ডেজ ভাবতে পারেননি তাঁর আবিষ্কার ত্রাতা রূপে দেখা দেবে। তবে প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ মোটেই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার জানতেন না। তখন এটি মূলত ডাক্তার নার্স ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত লোকেরা ব্যবহার করতেন। ধীরে ধীরে এর প্রচলন শুরু হয় মার্কিন সেনাবিভাগে। এরপর জনসাধারণ এর পরিচয় পেতে থাকে। এক সময় ‘সার্স’ ও ‘এশিয়ান ফ্লু’র প্রাদুর্ভাব আটকাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তবে ২০০৯ সালে ‘এইচ ওয়ান এন ওয়ান’ বা ‘সোয়াইন ফ্লু’র সংক্রমণ প্রতিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাধারণ লোকের মধ্যে পরিষ্কারের জন্য এই মূল্যবান মেডিক্যাল সামগ্রীর বহুল ব্যবহার নজর কেড়েছিল।

অন্যদিকে, ভারতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পরিচিত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। তবে একথা সত্যি যে, করোনা অতিমারির আগে আমাদের দেশের অনেক শহরে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আতঙ্কে সর্বসাধারণ এই মেডিক্যাল দ্রব্যকে চটজলদি মুঠোবন্দি করে নিয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্রেতা বা বিক্রেতা জানেন আজকের পরিস্থিতিতে কোন ধরনের স্যানিটাইজার বেশি উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন’ অর্থাৎ ‘সিডিসি’র ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজারে অ্যালকোহলের মাত্রা কমপক্ষে ৬০ শতাংশ হওয়া উচিত। তাইতো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার কেনার আগে বোতলের লেবেলে ছাপানো ইথানল (ইথানল অ্যালকোহল), আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল অথবা এন প্রোপানলের পরিমাণ দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। ডাক্তাররা বলছেন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঠিক গুণমান সম্পন্ন না হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এখন কোনো কোনো হ্যান্ড স্যানিটাইজারে ‘ফুড অ্যান্ড ড্রাগ’, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ বা ‘এফডিএ’ জানাচ্ছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের এই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি বমি ভাব, মাথা যন্ত্রণা, অন্ধত্ব ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতির কারণ হত পারে। এমনকী এর জন্য মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই মিথাইল অ্যালকোহল বর্জিত হ্যান্ড স্যানিটাইজারে ব্যবহারই বাঞ্ছনীয় বলে বিশেষজ্ঞমহল মত দিয়েছেন। এর মধ্যে বাজারে সস্তায় বিক্রি হওয়া হ্যান্ড স্যানিটাইজারের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রসায়নবিদরা দাবি করছেন, এই ধরনের সব স্যানিটাইজারে নানা ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি ত্বক ও চোখের ক্ষতি করছে। অন্যদিকে একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই, আজও অনেকেই স্যানিটাইজারের উপযুক্ত ব্যবহার জানেন না। হাতে কয়েক ফোঁটা স্যানিটাইজার নিয়ে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দুহাতের তালু ও তার ওপর অংশ ভালো করে ঘষতে হবে। ‘সিডিসি’ বলছে, শুকিয়ে যাওয়ার আগে স্যানিটাইজার যদি মুছে ফেলা হয় তাহলে তা জীবাণুনাশ করতে কার্যকর হবে না। হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতলকে যে কোনো ধরনের তাপ থেকে দূরে রাখার দরকার, কারণ অ্যালকোহল থাকা স্যানিটাইজার প্রচণ্ড অগ্নিদাহ্য হওয়ার দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই ধরনের স্যানিটাইজারের কারণে গায়ে আগুন লাগা বা বিস্ফোরণের ঘটনা এর মধ্যে আমাদের দেশেও ঘটেছে। □

বুকের পাটা থাকলেই ঘুষখোর

হীরক কর

তারিখটা ২ অক্টোবর। স্থান, ‘কর্ডেলিয়া ক্রুজ’ নামে একটি প্রমোদতরণী। মুম্বাই-গোয়ার মাঝে সমুদ্র পথ। সন্ধ্যে থেকেই চলছিল উদ্দাম নাচা গানা। সঙ্গে মদ্যপান আর মাদক সেবন। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন এক তারকা পুত্র। রাত একসময় জওয়ান হলো। নাচা-গানার আসর জমে উঠতেই তারকা পুত্রের হাত চেপে ধরলেন আরেক অতিথি। গোটা প্রমোদতরণী জুড়ে তৎপর হয়ে পড়লেন একদল ছদ্মবেশী আগন্তুক। তাঁরা নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর অফিসার। ওই তারকা পুত্র বলিউডের বেতাজ বাদশা শাহরুখ খানের ‘সু’-পুত্র আরিয়ান খান। আর হাত যিনি চেপে ধরলেন তিনি আর কেউ নন, বর্তমানে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর মুম্বাইয়ের জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে।

আরিয়ানের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় তার বন্ধু আরবাজ মার্চেন্ট এবং উঠতি মডেল মুনমুন ধামেচার-সহ ২০ জনকে। আরবাজ মার্চেন্টের থেকে ৬ গ্রাম এবং মুনমুন ধামেচার থেকে ৫ গ্রাম নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো বা এনসিবি। কয়েকদিন আগে নতুন অভিযোগ তোলা হয় আরিয়ানের বিরুদ্ধে। অভিনেতা চাংকি পাণ্ডের মেয়ে বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গেও নাকি মাদক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন আরিয়ান। এ কারণে অনন্যার বাড়িতে পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। তাকে বারবার ডেকে জেরাও করা হয়। অভিনেত্রীর মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২ অক্টোবর মুম্বাই থেকে গোয়াগামী প্রমোদতরী থেকে আটক করা হয়েছিল আরিয়ানকে। ৩ তারিখ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। ৮ অক্টোবর থেকে আর্থার রোড জেলে বন্দি ছিলেন আরিয়ান। ২৬ দিন জেল খাটার পর ২৮ অক্টোবর ছাড়া পান তিনি। যদিও আইনি জটিলতায় জেল থেকে বাড়ি ফিরতে পারেন ৩০ অক্টোবর বেলা এগারোটায়।

ওই প্রমোদতরণীতে তিনদিন এক মিউজিক্যাল যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। বলিউড, ফ্যাশন ও বাণিজ্য জগতের সদস্যরা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। ক্রে’আর্ক নামক ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফ্যাশনটিভি ইন্ডিয়া। হাজির ছিলেন আরিয়ন-সহ বলিউড ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু ব্যক্তি। ফ্যাশনটিভি ইন্ডিয়রই সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই প্রমোদতরণীতে তল্লাশি অভিযান চালায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো। আর সেই অভিযানেরই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সমীর।

সমীর ওয়াংখেড়ে, নাম তো শুনাহি হোগা? কেন শুনবেন না, বলিউডে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম সমীর ওয়াংখেড়ে। এই সমীর ওয়াংখেড়ে শাহরুখ খানের মাদকাসক্ত ছেলেকে ধরেছেন। এটাই কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় নয়। কিন্তু কে এই সমীর ওয়াংখেড়ে, যাকে সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে শাহরুখ খানের মতো প্রভাবশালী বলিউড তারকাকেও? ছেলেকে জেল থেকে ছাড়াতে লাগাতে হয়েছে ভারতবর্ষের তাবড় তাবড় আইনজীবীকে। যাদের নেতৃত্ব দিতে দিল্লি থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিল সতীশ মানসিন্ধে ও রোহতাগির মতো দেশের প্রথম সারির আইনজীবীদের।

ওয়াংখেড়ের কাছে খবর ছিল মুম্বইয়ের মাঝ সমুদ্রের ওই প্রমোদ তরীর হাই-প্রোফাইল পার্টিতে থাকতে পারেন বলিউডের কোনও এক স্টার কিড ও তাঁর বন্ধুরা। ফলে গান্ধীজীর

কে এই সমীর ওয়াংখেড়ে

- সমীর ওয়াংখেড়ে ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিস ২০০৮ ক্যাডারের অফিসার। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোতে যাগ দেবার আগে তিনি জাতীয় তদন্ত কমিশনে কাজ করেছেন। বিমানবন্দরে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বেও তাকে দেখা গেছে।
- সমীর ওয়াংখেড়ে যখন মুম্বই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তখন কাস্টম ডিউটি ফাঁকি দেবার অপরাধে বলিউডের কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রতারকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।
- কর ফাঁকি দেবার কারণেও সমীরের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়েছেন বলিউডের তারকারা।
- সমীর একবার অবৈধ বিদেশি মুদ্রা সঙ্গে রাখার জন্য বলিউডের গায়ক মিকা সিংহকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।
- ২০১১ সালে সমীর মুম্বই বিমানবন্দরে সঠিক এক্সিট ট্যাক্স না দেওয়া পর্যন্ত ক্রিকেটের বিশ্বকাপটি মুম্বইয়ের বাইরে যেতে দেননি।
- সমীর হিন্দি সিনেমার ভক্ত। নিজেই বলেন বলিউডের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কোনও বিদ্বেষ নেই। সম্প্রতি সমীর মরাঠি অভিনেত্রী ক্রান্তি রেডকরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

সমীর ওয়াংখেড়ের সমর্থনে প্রদর্শন।

জন্মদিনের রাতে ছদ্মবেশে টিম নিয়ে নিজেই সেখানে হাজির হন ওয়াংখেড়ে। এর আগে নিজের 'দাবাং' মেজাজের জন্য খবরে এসেছিলেন সুশান্ত-রিয়া কেসের সময়। এর আগেও তাঁর হাতে ধরা পড়েছে একাধিক বলি সেলেব। ২০১৩ সালে বিদেশি মুদ্রা-সহ মুম্বই বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেন মিকা সিংহ-কে। রিয়া চক্রবর্তীর ওপর তদন্তের দায়িত্বও ছিল তাঁরই কাঁধে।

২০০৮ সালে ব্যাচের আইআরএস আধিকারিক সমীর ওয়াংখেড়ে। সঙ্গে আবার তাঁর সঙ্গে রয়েছে বলি যোগাযোগও। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর এই অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে হলেন বলিউডের এক অভিনেত্রীর স্বামী। ২০০৩ সালে অজয় দেবগণের 'গঙ্গাজল' ছবিতে কাজ করেছেন ওই অভিনেত্রী। নাম ক্রান্তি রেদকরে। ২০০৭ সালে বিয়ে হয় সমীর ওয়াংখেড়ে আর ক্রান্তি রেদকরের। একাধিক মারাঠি ছবিতেও অভিনয় করেছেন ক্রান্তি। মারাঠি সিনেমা 'কাকন'-এর পরিচালনাও করেছেন তিনি। শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে শিরোনামে উঠে এসেছে আইআরএস আধিকারিক তথা বর্তমানে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর জোনাল অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে। তবে শাহরুখের সঙ্গে সমীরের যোগ এই প্রথম নয়। ২০১১ সালেও শাহরুখের 'মুখোমুখি' হয়েছিলেন সমীর। তখন তিনি এনসিবি কর্তা ছিলেন না। ২০১১ সালে সমীর ছিলেন শুল্ক দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার। সেই সময় মুম্বাই বিমানবন্দরে শাহরুখ খানের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় করেছিলেন সমীর।

এদিকে সম্প্রতি শাহরুখ পুত্রকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই বিতর্কে জড়িয়েছেন এনসিবি কর্তা। একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এমনকী আরিয়ানকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঘুষে নেওয়ার পরিকল্পনার অভিযোগও ওঠে। আর এই পরিস্থিতিতে আরও একটি অভিযোগ করলেন এনসিপি নেতা তথা মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রী নবাব মালিক।

সম্প্রতি নবাব মালিক নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো মুম্বইয়ের জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখে দাবি করেছেন যে অফিসার একটি আন্তর্জাতিক মাদক লর্ডকে সেই ক্রুজ পার্টি থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। অভিযোগ করা হয়েছে, যে ক্রুজের থেকে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাতেই ছিল একজন দাড়িওয়ালা আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া। তবে সেই মাফিয়াকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে এনসিবি কর্তার বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন নবাব। প্রমোদতরীতে রেভ পার্টির আয়োজন করেন কাশিম খান নামে এক ব্যক্তি। যিনি মাদক ব্যবসার দায়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিহার জেলে ছিলেন। রাজস্থানেও জেল খেটেছেন। সমীর ওয়াংখেড়ের বন্ধু হওয়ায় কাশিম খানকে গ্রেপ্তার করেনি এনসিবি। ফ্যাশন টিভির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এই কাশিম খান। নবাব মালিকের ওই অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন এনসিবির মুম্বইয়ের জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে।

মরারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী নবাব মালিকের অভিযোগ, ওয়াংখেড়ের আসল নাম সমীর দাউদ ওয়াংখেড়ে। পরিচয় ভাঁড়িয়ে হিন্দু সেজে এনসিবি চাকরি পেয়েছে তফশিলি কোটায়। শাবানা কুরেশির সঙ্গে তার বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন নবাব মালিক। আরিয়ান মামলার এক নম্বর সাক্ষী ছিলেন প্রভাকর সেল। প্রাইভেট গোয়েন্দা কিরণ গোসাভীর দেহরক্ষী। তার অভিযোগ, আরিয়ানের মুক্তির বিনিময়ে ২৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে এনসিবির তরফ থেকে। এর মধ্যে আরিয়ানের বিরুদ্ধে মাদক মামলা তুলে

সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অফিযোগের প্রতিবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি স্ত্রী ক্রান্তি রেদকরে।

নিতে ৮ কোটি টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন ওয়াংখেড়ে। এই নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় মুম্বাই পুলিশ প্রধানকে চিঠি পাঠান ওয়াংখেড়ে। তাতে লেখেন, 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। মিথ্যা অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হচ্ছে। আমাকে জেলে পোরার হুমকি দেওয়া হচ্ছে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথাও বলা হচ্ছে।'

নবাব মালিকের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার বাবা জ্ঞানদেব কাচরুজি ওয়াংখেড়ে। মহারাষ্ট্র সরকারের আবগারি দপ্তরের সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। নিযুক্ত ছিলেন পুনেতে। ২০০৭ সালের ৩১ জুন অবসর গ্রহণ করেছেন। আমার মা জাহিদা মারা গেছেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন থাকলেও আমাদের পরিবার ধর্মনিরপেক্ষ। আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাশীল। আমি তার জন্য গর্বিত। ২০০৬ সালের ৭ ডিসেম্বর ডাক্তার শাবানা কুরেশির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন মোতাবেক আমাদের বিয়ে হয়। মুম্বাইয়ের আন্ধেরি পশ্চিম লোখণ্ডওয়ালা কমপ্লেক্সে।' ২০১৬ সালে আইনি বিচ্ছেদ হয় তাঁদের।

শাবানার সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর ২০১৭ সালে শ্রীমতী ক্রান্তি দিনোনাথ রেদকরের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন তিনি। ওয়াংখেড়ে আদালতে হলফনামা দিয়ে বলেছেন, 'ব্যক্তিগত তথ্য টুইট করে আমার পারিবারিক গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। পরিবারকে দুর্নাম করা হচ্ছে। আমাকে, আমার পরিবারকে, বাবাকে এবং আমার মৃত মা-কে ছোটো করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য আমাকে এবং আমার পরিবারকে টার্গেট করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর একের পর এক টুইট আমার ও আমার পরিবারকে চাপে ফেলেছে। ব্যক্তিগতভাব আক্রমণ করায় আমি মর্মাহত। অথচ গত ৩৫ বছর এসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি।'

সমীর ওয়াংখেড়ে জানিয়েছেন তাঁর

জনপ্রিয় হলেই কি আইন ভাঙার অধিকার জন্মে যায় নাকি কারও : ওয়াংখেড়ে

অনেক কষ্টে টেলিফোনে ধরা গেল বিতর্কিত সমীর ওয়াংখেড়েকে। বললেন, 'আমরা আমাদের কাজ করি মাত্র। আমরা নিয়মকানুনে জোর দিই সবসময়। আর আইন তা সকলের জন্যই সমান। তাহলে কি আমরা নিয়ম ভাঙা সত্ত্বেও কেউ জনপ্রিয় বলে ছেড়ে দেব? জনপ্রিয় হলেই কি আইন ভাঙার অধিকার জন্মে যায় নাকি কারও? আমরা যদি দেখি কোনও নামজাদা মানুষ আইন ভাঙছেন, তাহলে কি চোখ বন্ধ করে থাকব!'

সমীর জানান, 'এরকম বহুবারই বলা হয়েছে, আমরা শুধু বলিউডকেই টার্গেট করি। তবে, এ সমস্ত বিষয় যেহেতু বিচারের আওতায় পড়ে, তাই তা নিয়ে কথা বলা ঠিক নয়। বরং তথ্য নিয়ে কথা বলাটাই ভালো। কারণ প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু বলাই ঠিক নয়'।

গত ১০ মাসে ১০৫টি মামলা হাতে নিয়েছেন সমীর ওয়াংখেড়ে। সেই উদাহরণ তুলে সমীর বলেন, '১০ মাসে ১০৫টি মামলা মানে প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২টি মামলা। আপনারাই বলুন এর মধ্যে ক'টা মামলা সেলেব্রিটিদের নিয়ে? এ বছর আমরা ৩১০ জনের বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছি। এর মধ্যে কতজন সেলেব্রিটি রয়েছেন? আসলে এগুলো বলতে হয় তাই বলেন। আমরা এ বছর ১৫০ কোটি টাকার অবৈধ জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছি। কই, কেউ তো এগুলো নিয়ে কথা বলছেন না!'

একই সঙ্গে মিডিয়ার প্রতিও কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেন সমীর ওয়াংখেড়ে। তাঁর কথায়, এখন আরিয়ান খান গ্রেপ্তার হয়েছে বলে এত খবর হচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগেই পাঁচকোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করল এনসিবি। আগের সপ্তাহেই প্রায় ৬ কোটি টাকার ড্রাগ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেগুলি আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল অথচ কেউ জানতেও পারেনি। সমীরের বক্তব্য, 'আসলে মিডিয়া এনসিবিকে নিয়ে লেখে না। যখনই কোনও বড়ো নামের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন প্রচারও হয়। এ জন্যই অনেকে মনে করেন আমরা শুধু বড়ো নামের পিছনেই দৌড়াই। কিন্তু তা একেবারেই ঠিক নয়।'

বিরুদ্ধে আনা তোলাবাজির অভিযোগের জন্য সবরকমের তদন্তের মুখোমুখি হতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণ থেকে রেহাই দেওয়া হোক তাঁকে। তাঁর প্রশ্ন, 'আমার পরিবারের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ তোলা হচ্ছে? কারণ আমার পজিশনের জন্য, তাই না? এর মাধ্যমে আমাকে তদন্তের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমি আদালতে সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হই'। নবাব মালিকের অভিযোগ প্রসঙ্গে সমীর ওয়াংখেড়ে আগেই জানিয়েছেন ব্যক্তিগত রোষ থেকে তাঁর উপর এমন আক্রমণ শানাচ্ছেন মন্ত্রীমশাই। এখানে বলা প্রয়োজন, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে এক মাদক কাণ্ডে নবাব মালিকের জামাই সমীর খানকেও গ্রেপ্তার করেছিলেন ওয়াংখেড়ে।

তাঁর জামাইকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন নবাব অভিযোগ তুলেছিলেন সেই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। জামাইকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার জামাইকে ফাঁসানো হয়েছে। এনসিবি যেটাকে ২০০ কেজি গাঁজা বলে দাবি করেছে, সেটা ছিল মাত্র সাড়ে ৭ গ্রাম। সিএ রিপোর্টেও দেখা গিয়েছে যে, উদ্ধার হওয়া বস্তু গাঁজা নয়, ভেষজ তামাক। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন এটাই যে, এত বড়ো তদন্তকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তামাক আর গাঁজার পার্থক্য বুঝল না এনসিবি?'

নবাবের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল ওয়াংখেড়ে। তিনি শুধু ভুয়ো মামলায় ফাঁসান। এর পরই নবাব হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'ওয়াংখেড়েকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, এক বছরের মধ্যে ওঁর চাকরি যাবে। ওঁকে জেলে পাঠিয়ে তবেই জনতা শান্ত হবে। আমাদের কাছে ওঁর বিরুদ্ধে প্রতিটি ভুয়ো মামলার প্রমাণ আছে।'

নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ের বোন ইয়াসমিনের অভিযোগ, নবাব মালিক তাঁর পরিবারকে নানাভাবে উত্যক্ত করছেন। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছবি নিয়ে তাঁর নিজের মানহানিও করা হচ্ছে। আর সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই মুম্বইয়ের ওশিওয়ারা থানায় মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন সমীরের বোন। দুই পাতার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ইয়াসমিন।

৪২ বছরের এই আইআরএস অফিসার ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানতে নারাজ এনসিবি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষের

নয় নয় করে প্রায় ১৩ জন বলিউড তারকা

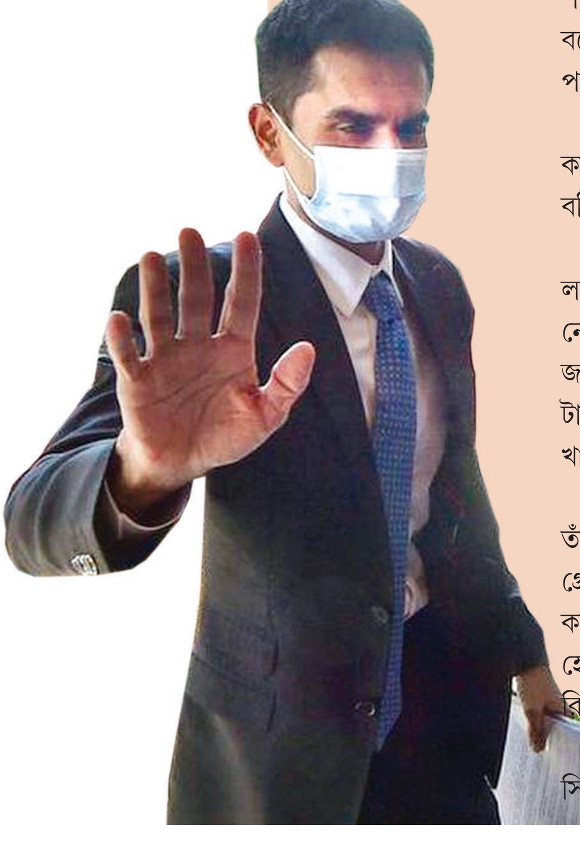

২০১১ সালে সপরিবারে লন্ডন থেকে মুম্বই বিমানবন্দরে ফিরে এসে ছিলেন শাহরুখ খান। সেই সময়, অতিরিক্ত ওজনের সামগ্রী সমেত শাহরুখ ভ্রমণ করছিলেন বলে তাঁর থেকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা নেওয়া হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়েছিল শাহরুখকে।

কেবল শাহরুখ খান নয়, সমীর ওয়াংখেড়ে একাধিক বলিউড তারকাকে কাস্টমস-সহ একাধিক মামলায় ধরেছিলেন এর আগে। নয় নয় করে প্রায় ১৩ জন বলিউড তারকা এই ২০০৮ সালের আইআরএস অফিসারের নজরে পড়েছিলেন।

২০১১ সালে শাহরুখ খান নিজে সমীর ওয়াংখেড়ের নজরদারিতে পড়েছিলেন। লন্ডন ও হল্যান্ড থেকে ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময় মুম্বই বিমানবন্দরে সমীর ওয়াংখেড়ের নেতৃত্বাধীন কাস্টমস টিম আটকে ছিল শাহরুখ খানকে। অতিরিক্ত লাগেজ রাখার জন্য তাঁকে জেরার মুখে পড়তে হয়। শাহরুখ খানের মতো মেগাস্টারকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল মুম্বই বিমানবন্দরে। তখনও রেয়াত করেননি শাহরুখ খানকে।

সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সরবরাহের অভিযোগ ছিল। ২০২০ সালে রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারের ঘটনার নেতৃত্বেও ছিলেন এই সমীর ওয়াংখেড়ে। সে সময় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর মুম্বই অফিসের জোনাল ডিরেক্টর ছিলেন এই সমীর ওয়াংখেড়ে। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে মাদক সরবরাহে এবং সেবনের কথা বলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রিয়া চক্রবর্তীকে।

সেই একই মাদক কাণ্ডে একে একে দীপিকা পাড়ুকোন, শ্রদ্ধা কাপুর, বকুল প্রীত সিংহ, সারা আলি খানকেও জেরা করেছে এনসিবি। এই সব তদন্তের নেপথ্যে ছিলেন

অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ভিজিলেন্স তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নারকটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো। ওই অভিযোগের তদন্ত করছেন এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিংহ।

২০০৮ সালের আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে। শাহরুখ বা তাঁর ভক্তরা বা ভারতের সাধারণ মানুষের ৯০ শতাংশই জানেন না আইআরএস কী? খায় না মাথায় দেয়। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস কি কাজে লাগে। সেখানে যোগদানের যোগ্যতার মাপকাঠি কী? নবাব মালিক কী যোগ্যতার সেই সব শর্ত কোনো দিনও পূরণ করতে পারতেন? শাহরুখ খানের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেকে ধরেছেন। ব্যাস! বদনাম করতে, ঘুষখোর প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে পড়েছে একশ্রেণীর দালাল। একশ্রেণীর ঘুষখোর পুলিশ আর অফিসার যে এর মধ্যে আছে, সেটা পরিষ্কার। তদন্তের আগেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

অথচ, যেই শাহরুখ খানের ছেলেকে ধরেছেন, নারকোটিক্স কর্তা হয়ে গেলেন ঘুষখোর। তাও হাতেনাতে বিলাসবহুল জাহাজের মাদক পার্টি থেকে। তাও আবার কী বোকা, যিনি একটা ফিল্মে অভিনয় করে ১০০ কোটি পান, তার ছেলের রেহাইয়ের জন্য মাত্র ২৫ কোটি চাইলেন সমীর। যে মানুষটা এর আগেও অনেক বড়ো বড়ো নেতা অভিনেতাকে ধরেছেন, ভয় করেননি, সে কত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ঘুষখোর! যে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের কাপ আটকে দেবার সাহস রাখে, সেও ঘুষখোর!

বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে মুম্বইয়ে মাদক কাণ্ড বার বার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। আর সেই পর্দা ফাঁসের নেপথ্যে যিনি ছিলেন, তিনি আর কেউ নন দুঁদে এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে। কিন্তু আরিয়ান-কাণ্ডে কি সমীর নিজেই জড়িয়ে পড়লেন 'চক্রব্যূহে'? দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে পড়ে হয়ে গেলেন 'বলির পাঁঠা'? সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহ অন্তত তেমনই ইঙ্গিত করছে।

মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তা হয়ে আসার দু'বছরের মধ্যেই ১৭ হাজার কোটি টাকার মাদকচক্রের পর্দা ফাঁস করেছেন ওয়াংখেড়ে। পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ থেকে শুরু করে অভিনেতা বিবেক ওবেরয় এবং পরিচালক রামগোপাল বর্মার মতো শীর্ষ বলিউড ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। ■

এই আই আর এস অফিসারের নজরে পড়েছিলেন

এই সমীর ওয়াংখেড়ে। কখনই তোয়াক্কা করেননি কাউকেই।

বলিউডের তাবড় মেগাস্টারদের কোনও না কোনও কারণে সমীর ওয়াংখেড়ের মুখোমুখি পড়তে হয়েছে। ২০১১ সালে মুম্বই বিমানবন্দরে আটকানো হয়েছিল অভিনেত্রী মিনিশা লাম্বাকে। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে এমিরেটস বিমানে ফিরছিলেন তিনি। ৫০ লক্ষ টাকা অঘোষিত হিরের গয়না সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য সমীর ওয়াংখেড়ের টিমের জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। মুম্বই বিমানবন্দরে ১৬ ঘণ্টা জেরার পর, জরিমানা আদায় করে ছাড়া হয়েছিল তাঁকে।

সেই বছরই অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মাকেও একই কারণে সমীর ওয়াংখেড়ের কাস্টমস টিমের জেরার মুখে পড়তে হয়। বিরাট কোহলির ঘরনি মুম্বই বিমানবন্দরে অঘোষিত প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার হিরের গয়না নিয়ে ফিরছিলেন। ১১ ঘণ্টা জেরার পর তাঁকে ছাড়া হয়েছিল বিমানবন্দর থেকে।

তার পরের বছর ক্যাটরিনা কাইফের দুই সহযোগীকে আটক করে মুম্বই বিমানবন্দরে জেরা করা হয়। কোনওরকম লাগেজ না নিয়েই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। পরে তাঁর লাগেজ নিতে বিমানবন্দরে যান তাঁর দুই সহযোগী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আটক করে ওয়াংখেড়ের টিম। ক্যাটরিনা কাইফের লাগেজ থেকে একটি অ্যাপেলের আইপ্যাড, অঘোষিত ৩০ হাজার টাকা এবং ২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছিল। ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল তাঁদের।

২০১৩ সালে মুম্বই বিমানবন্দরে রণবীর কাপুরকে আটক করেছিল সমীর ওয়াংখেড়ের টিম। ব্রিটেন থেকে ফিরছিলেন অভিনেতা। তাঁর কাছে অঘোষিত ১ লক্ষ টাকার দামি পারফিউম ও জুতো ছিল। তার জন্য সমীর ওয়াংখেড়ের টিম তাঁকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল এবং ৪০ মিনিট মুম্বই বিমানবন্দরে আটকে রেখেছিল।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিকা সিংহকে আটক করা হয়েছিল মুম্বই বিমানবন্দরে। ব্যাঙ্কক থেকে ৯ লক্ষ টাকার অঘোষিত সামগ্রী নিয়ে ফিরছিলেন তিনি। মুম্বই বিমানবন্দরে জরিমানা করেছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ের কাস্টমস অফিসাররা।

২০১৩ সালে পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপকেও পড়তে হয়েছিল সমীর ওয়াংখেড়ের কোপে। তখন সার্ভিস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন তিনি। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল অনুরাগ কাশ্যপকে। ২০১৩ সালে কর ফাঁকির অভিযোগে বিবেক ওবেরয়কে জরিমানা করা হয়েছিল।

এই সমীর ওয়াংখেড়ে ২০১১ সালে মুম্বই বিমানবন্দরে ভারতের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জেতা ট্রফি পর্যন্ত আটকে দিয়েছিলেন। অভিযোগ, সোনায় মোড়া ট্রফিটির আমদানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল। পরে বিসিসিআইকে সেই শুল্ক মিটিয়েই ভারতের বিশ্বকাপ ট্রফি ছাড়াতে হয়। ২০১১ সালের ২ এপ্রিল সেই ট্রফিই উঠেছিল মাহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে। ■

ফঃ ৪

অনন্য জীবনের অগ্রদূত গুরু নানকদেব

রবি রঞ্জন সেন

গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯) তুর্কি-মুঘল শাসিত পরাধীন ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দমিত, লাঞ্ছিত ও হতাশাগ্রস্ত জাতির মধ্যে নতুন চেতনা সঞ্চারিত করে নতুন উদ্যমে জেগে ওঠার পথ তিনি দেখিয়েছিলেন। এই সময়কালেই সমগ্র ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তোলার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন পঞ্জাবে গুরু নানক, কাশীতে সন্ত রবিদাস, বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, অসমে শ্রীশ্রীশঙ্করদেব। দেশের চতুর্দিকে শুরু হলো নতুন পরম্পরা। দেশজুড়ে ধর্মশক্তির এই জাগরণর ফলেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বিদেশি অত্যাচারী মুঘল সাম্রাজ্যকে সামরিকভাবে প্রতিহত করতে হিন্দুশক্তির উত্থান হলো— কোথাও শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের ছত্রতলে, কোথাও রাজপুত, জাট, বুন্দেলা ও শিখ শক্তির পতাকাতলে। গুরু নানকদেবের মতো মহাপুরুষরা যুগ যুগ ধরে আবির্ভূত হয়ে এই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছেন, সংরক্ষিত করেছেন, সমগ্র জগৎকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেছেন, ত্রস্ত মানুষকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন, সার্থক জীবনযাপনের দিশা দেখিয়েছেন।

অবিভক্ত পঞ্জাবের রাই-ভোই-কি- তলোয়ান্দীতে (যা বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত ও নানকানা সাহিব নামে খ্যাত) পিতা কল্যাণ চাঁদ দাস বেদী (বা মেহতা কালু) ও মাতা তৃপ্তা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান রূপে কার্তিকী পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন গুরু নানক। তাঁর জন্ম ও শৈশব সংক্রান্ত বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে যা প্রথম থেকেই তাঁর দৈবভাবের সাক্ষী দেয়। তাঁর শিষ্য ও সঙ্গীরা তাঁর জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত 'জনমসাখী'-তে নথিভুক্ত করে রেখেছিলেন এবং এগুলির থেকেই তাঁর জীবনের ছোটো-বড়ো ঘটনা জানা যায়। এই জনমসাথী অনুযায়ী পাঁচবছর বয়স থেকেই তিনি ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, যার ফলে অনেক সময়ে বাহ্যিক কাজ অবহেলিত হতো। এইসব দেখে কিছুটা চিন্তার সঙ্গেই তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে আঠারো বছর বয়সে সুলক্ষণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ দেন ও তিনি গৃহস্থধর্ম পালন করতে শুরু করেন।

সেই সময়ে দিল্লির শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদি। পাঠান রাজত্বের তখন শেষ যুগ। বাবরের ভগ্নীপতি সুলতানের অধীনে চাকরি করতেন। নানকও তাঁর চাকরিতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে নদীতে স্নান করতে যেতেন এবং স্নানের পর ধ্যানে বসতেন। একদিন এভাবেই স্নান করতে গিয়ে তিনি আর নির্দিষ্ট সময়ে ফিরলেন না। তিনদিন পর যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁকে দর্শন করামাত্র কারোর বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি যে অনুভূতির খোঁজে বেরিয়েছিলেন সেই অনুভূতি লাভ করেই ফিরেছেন।

এই সময় থেকে আলোকপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ রূপে মানুষের মধ্যে মান্যতাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর বাণী চতুর্দিকে প্রচারিত হতে শুরু হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাধনা, জীবনযাপন ও সহজ, সরল লোকভাষায় প্রচারিত বাণী বহু মানুষকে আকৃষ্ট কর এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী করে। বেদ ও উপনিষদের শাশ্বত বাণীকেই কথিত পঞ্জাবী ভাষায় অনাড়ম্বর যাপনের মাধ্যমে নতুনভাবে তিনি মানুষের কাছে নিয়ে যান। তাঁর বাণীর মধ্যে তিনি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন এবং আন্তরিক শুচিতা, পবিত্রতা ও সৎকার্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মযাপনের পরিবর্তে অন্তরের অনুভূতির দিকে বার বার তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রায় তিন দশক ধরে তিনি ভারত ও বহির্বিশ্বের নানা স্থানে পরিব্রাজনে বেরিয়েছিলেন, যেগুলিকে শিখ পরম্পরায় 'উদাসী' বলা হয়। সাতাশ থেকে সাতান্ন বছর বয়স পর্যন্ত তিরিশ বছর ধরে তিনি চারটি প্রধান উদাসীতে বেরোন যার ফলে আজও ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে। লাদাখ থেকে সিকিম সমগ্র হিমালয়, মধ্য ভারতের ঘন অরণ্য, পূর্ব ভারতের

ওড়িশা, বাঙ্গলা, সুদূর দাক্ষিণাত্য হয়ে শ্রীলঙ্কা, যেখানে তৎকালীন রাজা শিবনাভকে তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রভু জগন্নাথদেবের আরতি দর্শন করে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভজন রচনা করেছিলেন, 'গগন মে থাল, রবি চাঁদ দীপক, তারকা মণ্ডল জনক মতি', যাকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের জাতীয় সংগীত বলে অভিহিত করেছিলেন! সেই সময়ে পুরীতে সমুদ্রের নোনা জলের কারণে পানীয় জলের বড়ো অভাব ছিল। নগরবাসীর এই জলকষ্ট দূর করার জন্য তিনি সমুদ্র তটের এক স্থানে তিনি তাঁর দাঁত দিয়ে খনন করেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেখান থেকে সুমিষ্ট পানীয় জল বেরিয়ে আসে। গুরু নানকের স্মৃতিবিজড়িত এই কূপ এমনও পুরীতে বিদ্যমান সমুদ্রতটের নিকটেই। অবিভক্ত বাঙ্গলার বহু স্থানে তাঁর আগমন ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি— কলকাতা ও ঢাকা উভয় মহানগরই তাঁর পদরেণু দ্বারা পূত এবং বর্তমানে সেই স্থানগুলিতে গুরুদ্বার আছে। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ও সিকিমের গুরুডংমার হ্রদের মতো দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তিনি গিয়েছিলেন। ভারত ছাড়াও তিব্বত, সুমেরু পর্বত, মক্কা, বাগদাদ-সহ পশ্চিম এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি পরিব্রাজন করেছিলেন। এইভাবে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ভারতের পরিব্রাজক পরম্পরাকেই তিনি সমৃদ্ধ ও সংবর্ধিত করেন। এই পরিব্রাজনের ফলে মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল এবং মানুষের সুখ-দুঃখকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তিনি তাঁর বাণীর মধ্যে সেই অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারত আক্রমণ করে। যে ভয়ানক হিংসতার সঙ্গে মুঘল বাহিনী ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা গুরু নানক তাঁর রচনার মধ্যে দিয়েছেন। এই ঘটনা সংক্রান্ত চারটি কবিতায় তিনি বলেছেন, যে মুঘলরা খুরাসান ও মধ্য এশিয়া ছেড়ে যমের মতো ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করছিল— খুরাসান খসমানা কিয়া, হিন্দুস্থান দর্দিয়া। মুঘল সেনার হাতে ধর্ষিতা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নারীর হাহাকারকে তিনি এই কবিতাগুলিতে ব্যক্ত করেছেন। 'শহর জেহ্‌র্ কেহ্‌র্ সওয়া পহর' তিনি লিখেছিলেন— অর্থাৎ সোয়া এক প্রহর সময়কাল ধরে লাহোর শহরের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছিল। এই কবিতাগুলিতে তিনি কোনো অঞ্চল বা প্রদেশের কথা উল্লেখ করেননি, বরং বলেছিলেন আক্রান্ত হয়েছে সমগ্র হিন্দুস্তান। এই লেখাগুলির মাধ্যমে তিনি আক্রান্ত দেশ ও দেশবাসীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন।

গুরু নানকের রচিত প্রচুর ভজন, প্রার্থনা সংগীত ও স্তোত্র রয়েছে। শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবে তাঁর রচিত ৯৭৪টি স্তোত্র আছে। এগুলির মধ্যে শিখ পরম্পরায় সর্বপ্রধান হচ্ছে আসা দি বর ও জপজী সাহিব যার অন্তর্ভুক্ত মূলমন্ত্র আজও শিখ এবং নানকপন্থীদের প্রাতঃকালের নিত্য জপ। পঞ্জাবি ভাষায় রচিত এই মূলমন্ত্র '১ ওঁ সতিনামু পুরমু/নিরভউ নিরবৈরু অকাল মূরতি অজুনী সৈভং গুরপ্রসাদি।।' উপনিষদের নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মেরই সাধনা মন্ত্র। তিনি 'এক ওঙ্কার, কর্তার, অকাল, পিয়ারা, নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের উল্লেখ করেছেন। আবার সগুণ সাকার অবতারপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের নাম তাঁর বাণীর মধ্যে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। 'আতস্ মে রাম, রাম মে আতস্' এই বাণীর মধ্যে আত্মা পরমাত্মার একাত্মতা তিনি দেখিয়েছেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহের লেখার মধ্যে উল্লেখ আছে যে গুরু নানকের বংশ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ গুরু নানক মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরই বংশধর। তাঁর জীবনকালেই অসংখ্য ভক্তশিষ্য তাঁকে গুরুর মর্যাদা দিয়েছিলেন। সংস্কৃত 'শিষ্য' শব্দ থেকেই পঞ্জাবিতে 'শিখ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে, ফলে গুরু নানকের শিষ্যরা শিখ বা নানকপন্থী নামে খ্যাত। গুরু নানক গৃহস্থাশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁরই অনুসরণে সব শিখ গুরুরা গৃহস্থ ছিলেন। গুরু নানকের দুই পুত্র— শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীচাঁদ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং উদাসীন নানক সম্প্রদায় খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। নানকপন্থা ও নানকমতের প্রচার ও প্রসারে শিখ-মুঘল যুদ্ধের সময় গুরুদ্বারগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এই উদাসীন সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত ছিল। যে কোনো উদাসীন আশ্রম-মন্দিরে বাবা শ্রীচাঁদের মূর্তির সঙ্গে শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিব মর্যাদাসহকারে রক্ষিত হন। সারা ভারতবর্ষে বর্তমানে এই উদাসীন সম্প্রদায়ের আশ্রম আছে।

কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাসের বংশধরগণ বেদী বংশ নামে খ্যাত ও গুরু নানকের উত্তরপুরুষ রূপে শিখ পরম্পরায় এই বংশের বিশেষ মর্যাদা আছে। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী রূপে গুরু নানক মনোনীত করেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ভাই লেহ্‌নাকে, যাঁকে তিনি নামকরণ করেছিলেন অঙ্গদ, অর্থাৎ নানকেরই অঙ্গ। গুরু অঙ্গদই হলেন শিখ পন্থের দ্বিতীয় গুরু। এইভাবে বংশবাদের বিরুদ্ধে তিনি একটি বার্তা দিয়েছিলেন। শিষ্যরা মনে করেন যে গুরু নানকের অঙ্গ প্রতিটি গুরুর মধ্যেই প্রবেশ করেছিল, তাই সমগ্র গুরু পরম্পরাকেই গুরু নানকের অঙ্গ মনে করা হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহ হলেন দশম নানক, যাঁর পরে শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবকে গুরুর মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

গুরু নানকের ভক্তশিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ছাড়াও অনেক মুসলমান ছিলেন। পরিব্রাজন যাত্রাগুলিতে তাঁর অন্তরঙ্গ মুসলমান ভক্ত ভাই মর্দানা ছিলেন তাঁর সঙ্গী। গুরুর বিষয়ে বলা হয়েছে, 'নানক শাহ ফকির, হিন্দু বা গুরু, । মুসলমান কা পীর'। তাঁর এই সমন্বয়কারী ভূমিকা ভারতীয় সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ যা মানুষের মধ্যে কোনোরকম ভেদাভেদ স্বীকার করেনি। আজও পঞ্জাবে কেশধারী শিখ ছাড়াও প্রায় সমস্ত হিন্দুর ঘরে গুরু নানকের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। জাতি-পন্থ-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি শিষ্যদের আপন করে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়কারী ভূমিকা সত্ত্বেও তিনি আদ্যোপান্ত সনাতনী হিন্দু সাধক ছিলেন যিনি ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার বৈষ্ণব রীতি অনুসরণ করতেন। পুরাতন চিত্রে তাঁকে ললাটে তিলক-শোভিত ও জপমালা-কমণ্ডলু হস্তে চিত্রায়িত করা রয়েছে।

গুরু নানক তাঁর জীবন, সাধনা ও বাণী দ্বারা ভারতীয় ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য-সহ সমগ্র জ্ঞান পরম্পরাকে পুষ্ট করেছেন। কথিত, পঞ্জাবী ভাষায় যুগোপোযোগী আকারে মানুষের বোধগম্য শব্দে তিনি প্রচার করেছিলেন। সাধু-যোগীদের তিনি উপদেশ দিতেন নির্জন পাহাড়ে-গুহায় বসে সাধনা করার চাইতে মানুষের মধ্যে গিয়ে, তাদের সুখ-দুঃখর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সংসার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করা শ্রেয়।

শেষজীবনে গুরুদাসপুর বা করতারপুরে তিনি বসবাস শুরু করেছিলেন এবং ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে ভজন-কীর্তন ও বাণী রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। গুরু নানক তাঁর বাণীর মধ্যে পঞ্জাবের সাধারণ মানুষের উপর মুঘল অত্যাচারকে তুলে ধরেছিলেন আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত পন্থ পরবর্তীকালে গুরু তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। শিখপন্থের যোদ্ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র পঞ্জাব ও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পাঠান-মুঘল শক্তিকে ধূলিসাৎ করে আফগানিস্তান পর্যন্ত ভারতীয় পরাক্রমের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহিব ও মৃত্যুস্থল করতারপুর সাহিব উভয়ই আজ আমরা দেশভাগের ফলে হারিয়েছি।

ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকার সময়ে, যখন যুগ যুগ ধরে লালিত পালিত ভারতীয় জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, সমগ্র হিন্দুস্থান 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত হওয়ার অশনি সংকেত দেখা দিয়েছিল, তখন গুরু নানক ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক চেতনার বার্তাকে নতুনভাবে প্রচার করে এদেশের হিন্দুত্বকে পুনর্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। ■

মাধবস্মৃতিতে লোকপ্রজ্ঞার বিজয়া সম্মেলন

গত ২৪ অক্টোবর কলকাতার ২৬ নম্বর বিধান সরণীস্থিত মাধব স্মৃতিতে লোকপ্রজ্ঞার বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পূর্ব ও পশ্চিম ওড়িশার শতাধিক কার্যকর্তা, যাঁরা দেশের বর্তমান অবস্থার সাক্ষী এবং গৌরবময় অতীতের আঙ্গিকে স্বর্ণোজ্জ্বল ভারতবর্ষ নির্মাণে কার্যরত, করেন লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ড. শিশুতোষ সামন্ত, সন্দীপ কুমার সিংহ, সৈকত নিয়োগী, সৌমব্রত সামন্ত এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু ও কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল। চারটি পুস্তকের লোকার্পণ করা হয় অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠন মন্ত্রের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। তাঁর কুশলী নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংযোজক জগন্নাথ নন্দকুমার। উপস্থিত ছিলেন ড. ঋষিকেশ রায়, জ. রাজশ্রী শুক্লা, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, ড. দেবনাথ মল্লিক, শ্রীমতী পারমিতা গুপ্ত, শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র, ড. ইন্দ্রাণী মণ্ডল, ড. রাসবিহারী ভড়, ড. বিপ্লব লৌহচৌধুরী, ড. অনিল বিশ্বাস, ড. বিজয় আঢ্য, ড. তিলকরঞ্জন বেরা। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখে সকলকে অনুপ্রাণিত মুখ্য বক্তা জে নন্দকুমার ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করার আবেদন জানান। তিনি হিন্দু মেলার প্রাসঙ্গিকতা, তৎকালীন এবং বর্তমান ভারতের প্রসঙ্গে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা এবং তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

তিনি লোকপ্রজ্ঞার কার্যকর্তাদের পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেশ কয়েকজনের দায়িত্ব ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্ত ও পূর্বক্ষেত্র গবেষণা প্রমুখ ড. রাকেশ দাস।

গো-আধারিত গ্রাম বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বর্গ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় গো-আধারিত গ্রাম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করে চলেছে গোসেবা গতিবিধি। কুলতলী-২ খণ্ডের নলগড়া পঞ্চায়েতের সোনাটিকারী গ্রামে গত ২২ থেকে ২৮ অক্টোবর গোগ্রাম কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। নলগড়া অঞ্চলের পাঁচটি গ্রাম থকে ১৬ জন চাষি এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের কৃষ্ণপুর অঞ্চলের চকবাহাদুরপুর গ্রামে গত ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। এই বর্গে পাঁচটি গ্রাম থেকে ১৪ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ বর্গে কৃষকদের হাতে-কলমে শেখানো হয় অমৃতজল তৈরির পদ্ধতি, কীট নিয়ন্ত্রক তৈরি ও বীজশোধন পদ্ধতি। এছাড়া গোময় দন্তমাজন পাউডার, গোময় বাসন মাজা পাউডার, মুখশ্রী, গোময় পূজা ধূপ তৈরির পদ্ধতিও শেখানো হয়।

বারুইপুরের স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক সুকুমার নস্কর প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পূর্ণ করে জানান, বিষমুক্ত খাদ্যান্ন উৎপাদন করতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ বর্গ অত্যন্ত উপযোগী। একমাত্র গো-আধারিত কৃষিই পারে ভূ-মাতাকে সুস্থ রেখে কৃষকের আর্থিক সমৃদ্ধি আনতে। আগামীদিনে এরকম প্রশিক্ষণ বর্গ কৃষকের জীবনে নতুন দিশা দেখাবে। মালদার প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পন্ন করে কৃষক অজয় মণ্ডল বলেন, দুধ দেয় না এমন গোমাতার থেকেও কৃষক সমৃদ্ধ হতে পারে।

সূর্যের ছটায় আলোকিত ছটমাঈয়া

অমিত লাল ঠাকুর

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলোর মধ্যে যে যে নামগুলো আসে, তাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রথম সারিতে পড়ে। যদিও বিশ্বের প্রাচীন প্রায় সমস্ত ধর্মই আজ বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির পথে, একমাত্র এই একটিমাত্র ধর্ম ছাড়া। প্রায় ৮০০০ বছরেরও বেশি সময় (Winternitz ও বালগঙ্গাধর তিলকের মতে বৈদিককাল প্রায় খ্রি.পূ. ৬০০০ থেকে শুরু) অতিক্রান্ত করে আজও সগৌরবে এগিয়ে যাওয়া এক সভ্যতা আমাদের, এ কী কম গর্বের কথা!

আমাদের মধ্যে সেই প্রাচীন বৈদিক সময়কাল থেকেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ও তাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো বর্ষাকে সম্মান জানিয়ে ইন্দ্রদেব, অগ্নিকে স্মরণ করে অগ্নিদেব ইত্যাদি শক্তি প্রমুখ দেবতারূপে মেনে নিয়ে তাঁদের স্তুতির পাশাপাশি সূর্যকে দেব ও ঊষাকে দেবীরূপে আরাধনা করা হয়ে আসছে, আমাদের প্রতি তাঁদের অসীম ভূমিকার কারণে। বৈদিককালের প্রাচীন এই সূর্য ও ঊষার আরাধনারীতিরই ক্রমবিবর্তিত রূপ হলো ছটপুজো। তাই বলা যেতেই পারে, হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম উৎসবগুলির মধ্যে এই ছটপুজো একটি অন্যতম আরাধনা। বলাবাহুল্য, হিন্দুধর্মের বৈদিক রীতি অনুযায়ী পার্বণগুলোর মধ্যে ছটপুজোর মতো খুব কম উৎসবই এখনো টিকে রয়েছে।

এই পুজো সূর্যের ছটার পুজো, সেই ছটা থেকেই 'ছট্' নামকরণ। তাছাড়া, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিত এই পুজো হয়, তাই সংস্কৃত 'ষষ্ঠী' শব্দের মূল শব্দ 'ষট্' শব্দ হতেও 'ছট্' নামটি এসে থাকতে পারে বলেও মনে করা হয়।

ছটপুজো ও তৎসম্পর্কিত পালনীয় রীতিগুলো বেশ দুরূহ ও দীর্ঘ। এইদিন সমস্ত রীতি অতি সাবধানতার সঙ্গে ও ভক্তিসহকারে পালন করে থাকেন ব্রতীরা। শুধু ব্রতীরাই কেবল নয়, এমনকী ব্রতীর আত্মীয়স্বজন ও বাড়িতে আসা প্রত্যেককেই সেসব নিয়ম পালন করতে হয়। সারা বাড়ির নির্মলতা বজায় রেখে সকলে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন এই পুজোর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে।

কালীপুজোর পরেরদিন (শুক্ল প্রতিপদ তিথি) ছট্ পুজোর প্রথম দিন। এই থেকেই সম্পূর্ণ নিরামিষ খাওয়ার মাধ্যমে এবং বাড়িঘর ও কাপড় চোপড় গৃহস্থের সকল কিছু ধুয়েমুছে খুব মান্যতার সঙ্গে এই পুজোর নিয়ম শুরু হয়। তারপরের তৃতীয়ার দিনে ব্রতী-সহ বাড়ির সকলে গঙ্গাস্নান করে সেই জল এনে বাড়িঘর পরিশুদ্ধ করে থাকেন। চতুর্থীর দিন 'লাউভাত'। এদিন লাউয়ের তরকারি, লাউ দিয়ে ছোলার ডাল ও আতপচালের ভাত উপোসীরা খেয়ে থাকেন। আর এই খাবারই বাড়ির বাকিদেরও খেয়ে পুজোর নিয়ম মানতে হয়। পঞ্চমীর দিন সারাদিন উপোসি নির্জলা উপোস থেকে রাতে বন্ধ ঘরে ঘটস্থাপনপূর্বক 'খার্না' পুজো করে প্রসাদ (উনোনে আমকাঠ দিয়ে তৈরি রুটি, কলা ও আখের গুড়ের পায়েস) খেয়ে থাকেন। খাবার সময় ঢাক অনবরত বাজে। কেবল ঢাকের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনলে আর উপোসি খেতে পারবেন না। তাই এ বিষয়ে বাকিরা খেয়াল রেখে থাকেন। কারণ, এই একদিনের উপোস ভাঙার পর পরপর টানা আবার দুদিনের উপোস থাকে। বিষয়টি সত্যিই ভাবার কিন্তু! যাই হোক, খাওয়া শেষে উপোসি ঘর খুলে বেরিয়ে এলে বাকিরা সেই প্রসাদ ভাগ করে গ্রহণ করেন। উপোসি ষষ্ঠীর দিনে সারাদিন নির্জলা উপোস থেকেই বিকেলে সেই স্থাপিত ঘট নিয়ে গিয়ে নদীর তীরে স্থাপন করে পুজোপূর্বক অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান ও ধূপ-দীপের আরতি এবং সপ্তমীর দিনে উদীয়মান সূর্যের দ্বারা সূর্যের বোন (মতান্তরে স্ত্রী) ঊষাদেবীকে (ছটীমাঈয়া) অর্ঘ্য প্রদান ও সূর্য-ঊষার আরতি করে থাকেন। সেদিন সকলে নদীতে নিজের ও নিজ আত্মীয়দের নামে প্রদীপ ভাসিয়ে থাকেন। এরপরই নদী

থেকে বাড়ি ফিরে উপোসি দীর্ঘ সেই নির্জলা উপোস আখের গুড়ের শরবত পান করে ভাঙেন। শেষদিন অর্থাৎ সপ্তম দিনে নদীতে পুজো শেষ করে বাড়িতে মৎস্যমুখীর মাধ্যমে ছয়দিনব্যাপী এই পুজোর সমাপন হয়ে থাকে।

এতো আচার নিয়ম জেনে এটা বলাই যায়, এই পুজো করা খুবই দুরূহ। কারণ, পঞ্চমী থেকে সপ্তমীর এই তিনদিনের দীর্ঘ নির্জলা উপবাসের মধ্যে মাত্র একবারই উপোসি জল ও খাবার (খার্নার সময়) খেতে পান। অনেক সময় যে কোনো শব্দ হলেই বা অন্যকিছু কারণবশত সেই খাওয়াটুকুও বাদ দিতে হয়, তাছাড়া, সারা পঞ্চমীর দিন উপোস থেকে মাঝরাতে শুধু গুড়ের পায়েস ও শুকনো রুটি খাওয়াও যায় না। অর্থাৎ ওই তিনটি দিন প্রায় একপ্রকার না খাওয়া অবস্থাতেই চলে যায় ব্রতীদের। এই অবস্থাতেও অনেক ব্রতী আবার নিজ মনস্কামনা পূরণের আশায় বাড়ি থেকে নদী যাবার সম্পূর্ণ পথটাই শুয়ে শুয়ে দণ্ডি কাটতে কাটতে যান। মান্যতা আছে, এই পুজোতে সকলের মনোকামনা সম্পূর্ণভাবে পূরিত হয়। এক কথায়, কালীপুজো থেকেই এই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এই পুজো সম্পর্কিত সকল নিয়ম-রীতিগুলো শিষ্টাচারের সঙ্গে ও চূড়ান্ত মান্যতার দ্বারা পালন করতে হয়।

ছটপুজোর বিবিধ মাহাত্ম্য :

ছটপুজো কেবল কঠিন নিয়ম-রীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই পুজোর বৈদিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্যও অসীম তথা তাৎপর্যবহ। যেহেতু এই পুজো বৈদিক আরাধনারই বিবর্তিত রূপ, তাই এই উৎসবের মাহাত্ম্যও কিন্তু অনেক প্রাচীন সংস্কৃতিধারারও বাহক এবং এই পুজোতে কিছু সামাজিক বার্তাও লক্ষণীয়। আমরা প্রকৃতির কাছ থেকেই সবকিছু পাই, তাই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দ্রব্যের দ্বারা প্রকৃতির প্রতি আকুল শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে এই পুজো করা হয়ে থাকে।

বৈদিক রীতি থেকে বিবর্তিত এই পুজোতে কোনো মূর্তির প্রাসঙ্গিকতা থাকে না (যদিও অনেক স্থানে মূর্তি বসানো হয়, কিন্তু যা নিয়মানুগ একেবারেই নয়), কারণ, সূর্য ও ঊষার গুণের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়টি স্মরণ করেই তাদের সর্বময়গুণের পুজো করা হয়, রূপের নয়।

এই পুজো খার্নার দিন (পঞ্চমীর দিন) উপোসিরা নিজেই করেন, পরদিন (ষষ্ঠী) বিকেলে ও তারপরের দিন (সপ্তমী) ভোরে উপোসিরা নদীতে গিয়ে নিজেই অর্ঘ্য ও পুজো দিয়ে থাকেন। এই পুজোয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। পুরোহিত বা মূর্তি ছাড়া কোনো পুজো হিন্দুধর্মে খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে।

শুধুমাত্র ঠেকুয়া ব্যতীত সমস্ত মূলদ্রব্য (unprocessed) সামগ্রী দিয়েই (যেমন— অখণ্ডিত ফল, কলার কাঁদি, আখ, মিষ্টি কুমড়ো, পুঁইশাক, বরবটি, হলুদ গাছ ইত্যাদি) এই পুজো সম্পন্ন হয়। মূর্তি, ব্রাহ্মণ ও রান্না করা ভোগ— এসব ব্যতীত তথাকথিত বর্তমান পূজাপদ্ধতি থেকে ভিন্ন এই আরাধনা কিন্তু বৈদিক যুগেরই আরাধনা পদ্ধতি।

এ তো গেল বৈদিক মাহাত্ম্যের দিক, এবার পৌরাণিক মাহাত্ম্যের দিকে আসি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা প্রিয়ব্রত এই পুজোর প্রচলন করেন। পুত্র না হওয়ায় এবং পরে মৃতপুত্র লাভ হলে মহর্ষি কশ্যপ তাঁকে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করার উপদেশ দেন। সেই যজ্ঞ থেকে উজ্জ্বল আলোর ছটারূপে ছটীমাইয়া (ঊষাদবী) আবির্ভূতা হন এবং বলেন— 'আমি ব্রহ্মার পুত্রী, আমি সন্তানপ্রদানকারিণী, পুত্রকামীদের আমি পুত্র প্রদান করে থাকি।' —এই বলে তিনি রাজার মৃত পুত্রকে জীবিত করেন। ফলস্বরূপ রাজা এই পুজোর প্রচলন করেন। তাই, অপুত্রকেরা পুত্রলাভের আশায় এই পুজো নিষ্ঠাসহকারে করে থাকেন। রামায়ণেও এই পুজোর উল্লেখ আছে, শ্রীরাম ও সীতা কার্তিক শুক্লষষ্ঠীতে বারণহত্যার পাপস্খলনের জন্য এই পুজো করেছিলেন এবং পরেও এই সূর্যোপাসনা করতেন।

মহাভারতেও এই পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্দম নামক ঋষিকে অজান্তে হত্যার পর পাণ্ডুর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য কুন্তী পাণ্ডু ও মাদ্রীকে নিয়ে সরস্বতী নদীতে সূর্যের আরাধনা করেছিলেন। আবার, পাশাখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেললে কুন্তী দ্রৌপদীকে সূর্যের এই আরাধনা করান সর্বস্ব পুনরায় ফিরে পাবার জন্য। তাছাড়া, সূর্যপুত্র কর্ণ অঙ্গরাজ থাকাকালীন এই আরাধনা করতেন।

এই পুজোর পেছনে সামাজিক মাহাত্ম্যও বর্তমান, পুরাকালে যখন সূর্যদেবের প্রখর তাপে নদীনালা শুকিয়ে যেত, অসহনীয় খরা ও জলের অভাব ইত্যাদি বিবিধ কষ্টকর পরিস্থিতি দেখা দিত— সূর্যদেবকে তুষ্ট করলে এসব বিঘ্ন থাকবে না, চাষাবাদেও বিঘ্ন ঘটবে না, তাই এই পুজো করা হতো বলেও মত।

তাছাড়া সূর্যদেবের এই আরাধনার মাধ্যমে জীবনের সমস্ত রোগ তথা বিঘ্নবিপত্তিসমূহেরও নাশ হয় এবং সুখ ও অর্থবৈভব হয়, এই উদ্দেশ্যেও পুজো করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এই পুজোর বহু বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্যও দৃষ্ট হয় শীতের শুরুতে আমাদের শরীরে বহু রোগ বাসা বাঁধে, এই সময় সকাল ও বিকেলে সূর্যের সাক্ষাৎ তাপ শরীরের সেসব রোগের পাশাপাশি চর্মরোগও দূর করে। একভাবে জলে দাঁড়িয়ে মনের একাগ্রতা মনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পা ও কোমরের বাতজনিত সমস্যার কিছুটা উপশম হয়। তাছাড়া, হাতের অঞ্জলিতে করে জল মুখের সম্মুখে নিয়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে অর্পণ করবার সময় হাতে থাকা জলে যে সূর্যের কিরণের ছটা পড়ে, তা ব্রতীর চোখেও প্রতিফলিত হয়, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং মস্তিষ্কের বিকার দূর করতে সহায়তা করে।

যাই হোক, এই মহতী আরাধনা পদ্ধতি হয়তো বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি অসীম অবদানগুলোকে স্মরণ করে সেই শক্তির প্রতি এতোটা ভক্তি, সম্মান ও সমর্পণের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সত্যিই একটা সভ্যতার সর্বদিক সমন্বিত মহান পরাকাষ্ঠাই বটে।

(লেখক মালদা গৌড় মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় শিক্ষক)

মহাপ্রেম ও মহামিলনের উৎসব রাস

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আধ্যাত্মিকতার অন্যরূপ ঃ

একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা ও দর্শন যেভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার একটি বাঙ্ময় রূপ নিয়েছে, তা সত্যিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। একটি বিশেষ দর্শনকে কেন্দ্র করেই রাসলীলার উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু যুগের আবর্তনে সেই বিশ্বাস ও দর্শন একই সঙ্গে এক ধ্রুপদী অনুষ্ঠান থেকে লোক উৎসবে পরিণত হয়। আর সম্ভবত সেই কারণেই রাসলীলা শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডিতে বদ্ধ না হয়ে সারাদেশেই এক সমাদৃত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও রূপ নিয়েছে।

রাস উৎসব প্রাথমিকভাবে অবশ্যই একটি বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান। রাধা-কৃষ্ণ ও গোপিনীদের প্রেম সাধনার একটি প্রকাশ রাস। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিকাশের পথে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে বৃন্দাবন, মথুরাসহ ব্রজধাম তথা উত্তর ভারত এবং বঙ্গদেশে রাস অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বঙ্গদেশে রাস কিন্তু কেবলই একটি বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান নয়। নবদ্বীপে একই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের রাসের পাশাপাশি শাক্ত রাসও পালিত হয়।

শাক্ত রাস ঃ বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক এবং নানা প্রবক্তার মতে নবদ্বীপে রাধা-কৃষ্ণের রাস অনুষ্ঠানের বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল শাক্ত রাস। শ্রীচৈতন্যর আগে নবদ্বীপে প্রাধান্য ছিল শাক্তদের। বৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। শাক্তদের দাপটে সেই বৈষ্ণবরা তাঁদের সব আচার-অনুষ্ঠানই পালন করতেন কিছুটা আড়াল রেখে—প্রায় গোপনেই। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যে পরিণত হওয়ার কিছু আগে থেকেই বৈষ্ণবদের সংগঠিত করতে থাকেন। ফলে বৈষ্ণবরা আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে প্রকাশ্যেই তাঁদের আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে থাকেন। ক্রমে নবদ্বীপ শাক্ত আচার ভুলে শ্রীচৈতন্য নির্দেশিত পথে কৃষ্ণ ভজনা ও শ্রীরাধার অর্চনা শুরু করে। তারই পরিণতিতে নবদ্বীপে শাক্ত রাসের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের লীলা সংবলিত বৈষ্ণবীয় রাসই প্রাধান্য পায়। ক্রমে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পরবর্তী মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পোষকতায় নবদ্বীপের বৈষ্ণবীয় রাস উৎসব সারা বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়।

নবদ্বীপের রাসমেলা বা উৎসব সম্পর্কে পাওয়া তথ্য থেকে বোঝা যায়, নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব বর্তমান রূপ পেয়েছে। নবদ্বীপের রাস সম্পর্কে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগা কাহিনি' থেকে জানা যায়, বর্তমানে নবদ্বীপে নানা প্রতিমা ও মূর্তি দিয়ে যে রাস উৎসব এবং অর্চনা হয়ে থাকে, আগে কিন্তু তা হতো না। সে সময় প্রতিমার পরিবর্তে পটচিত্রে রাখা হতো রাস-পুজো। সেই পটের পুজোই ক্রমে রূপ নেয় প্রতিমা পুজোর। এই রাসে গড়া হতে থাকে নানা দেবীমূর্তি। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হন দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা। এই প্রতিমাগুলি খুব একটা ভারী হতো না। পাঁচ ছ'জন লোকই এই প্রতিমা কাঁধে তুলে নিয়ে নানারকম নাচগান করত।

কার্তিকচন্দ্র রাঢ়ীর 'নবদ্বীপ মহিমা' গ্রন্থে আছে, রাসে হতো ভগবতীর পুজো। বিভিন্নভাবে হতো তা। সে পুজো দেখতে নবদ্বীপে আসতো নদীয়ার মহারাজও। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠ প্রতিমাকে দেওয়া

হতো পুরস্কার।

এইসব প্রতিমা নির্মাণে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা দিতেন পারদর্শিতার পরিচয়। শাস্ত্রীয় বিধি মেনে তাঁরা তৈরি করতেন শক্তির নানা রূপ-মূর্তি। শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনেই ধ্যানমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা রূপ দিতেন দেবী প্রতিমার। সুষমায় ও রূপ মাধুর্যে সেসব মূর্তি মানুষকে নিয়ে যায় ভিন্ন এক ভাবলোকে। এমনই জানিয়েছেন প্রয়াত বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর স্মৃতিচারণে।

নবদ্বীপে শাক্ত রাসের প্রাধান্য থাকলেও চৈতন্যযুগ থেকেই বঙ্গদেশে রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, কালনা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি জায়গায় শ্যামরায়, মদনমোহন প্রভৃতি মন্দিরগাত্রে রাধা-কৃষ্ণের লীলা সংবলিত টেরাকোটার অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। বঙ্গদেশে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে কোচবিহারের রাসমেলা বেশ বিখ্যাত।

উৎস ভাগবত ঃ কবে থেকে রাস উৎসবের প্রবর্তনা তা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। তবে পৌরাণিক যুগেই এই উৎসবের সূচনা এমন কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। ভাগবত পুরাণে সরাসরি রাধার বলা না হলেও শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে এক কার্তিকী পূর্ণিমায় রাতে গোপিনীদের নিয়ে রাসক্রীড়ায় মেতেছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই রাসক্রীড়ায় একজন প্রধান গোপিনীর কথা বলা আছে। পরবর্তীকালের শ্রীরাধার উদ্ভবের এটিই উৎস বলে অনেকে মনে করেন। জয়দেবের ভাগবতে রাধার প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও পাঁচটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণর এই রাসক্রীড়ার কথা। এই পাঁচটি অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে গড়ে উঠেছে রাসপঞ্চাধ্যায়িকা—যাকে বলা হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম আকর গ্রন্থ।

এরপর অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাসলীলার প্রধান গোপিনী হিসেবে রাধার নাম পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ গ্রন্থে পাওয়া যায় রাধা-কৃষ্ণের রাস তথা রঙ্গলীলার বিশদ বিবরণ। মধুর বা শৃঙ্গার রসামৃত রাধা-কৃষ্ণের লীলা জয়দেবে এসে কিছুটা অতি রসাত্মক হয়ে উঠেছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। তাঁদের বক্তব্য মূলত কথাকার বা কথকরা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাসলীলার গূঢ় রহস্য বা বৌদ্ধিক চিন্তাধারার বর্ণনা না করে কিছুটা সস্তা আদিরস অবলম্বন করেছেন। মোটামুটি গীতগোবিন্দের নজির দেখিয়ে তাঁরা রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমকে একবারে পার্থিব প্রেমের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন।

রাসের অর্থ ঃ রস্ ধাতু থেকে এসেছে রাস। রাসের সাধারণ অর্থ শব্দ, ধ্বনি, কোলাহল, বাক্য, ভাষাশৃঙ্খল ইত্যাদি। কিন্তু সকলের কাছে রাস বলতে বোঝায়, দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রসাভিসার। পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ নৃত্য করেছিলেন, তাকেই বলা হয় রাস বা রাসনৃত্য। ভাগবতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্ত নৃত্য বিশেষ। অর্থাৎ রাস হলো বহু নর্তকীর সঙ্গে নৃত্য বিশেষ। আর ভক্তজনের কাছে রাস হলো রাধা-কৃষ্ণের লীলা। সংস্কৃত শব্দকোষ মেদিনী-র ব্যাখায়, রাস গোপেদের এক ক্রীড়া বিশেষ। রাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখায় বলা হয়, রাস হলো প্রকৃতপক্ষে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের সাধনা।

এইসব অর্থ থেকে স্পষ্ট, রাস হলো এক ধরনের প্রাচীন লোকনৃত্য। যেখানে নারী-পুরুষ একইসঙ্গে নৃত্য করতেন। পরবর্তীকালে কত্থক, কথাকলি, কুচিপুরি, মণিপুরী ইত্যাদি ধ্রুপদী নৃত্যগুলির উদ্ভব হয়েছে এই রাস নৃত্য থেকে। এমনটাই পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

রাসের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বিশেষ দুটি শব্দ—রাসমণ্ডল এবং রাসচক্র। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখায় বলা হয়েছে—মণ্ডল বা চক্রের আকারে অর্থাৎ গোল হয়ে দাঁড়ানো প্রতি দু'জন গোপীর মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণকে রেখে গোপিনীরা কার্তিকী পূর্ণিমার রাতে নৃত্য করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হলো, শ্রীকৃষ্ণ ভাবেই তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য গোপিণীদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। ভাগবতে বলা হয়েছে, রাসোৎসবে বৃত্তাকারে অবস্থিত দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তাতে প্রতিটি গোপীর মনে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ বুঝি একা তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কেননা তাঁকেই আলিঙ্গন করে আছেন।

ব্রজভূমে রাস ঃ রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা ও উৎসবের কেন্দ্রস্থল ব্রজভূমি। বৃন্দাবন, মথুরা অঞ্চলে রাস উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিটি জায়গা সেজে ওঠে আলোর মালায়। মন্দিরে মন্দিরে হয় বিশেষ পূজা, কীর্তন ও কৃষ্ণলীলা কথা পরিবেশনের আসর। সে উৎসবে শামিল হন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ভক্ত পর্যটকের দল।

বৃন্দাবনে রাসলীলা অন্যতম কেন্দ্রস্থল নিধিবন। চলতি কথায় অনেকে বলেন নিধুবন। নিধি শব্দের অর্থ সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা কেন্দ্রে এই বনাঞ্চল হলো আধ্যাত্মিকসম্পদে পরিপূর্ণ।

প্রচলিত একটি কাহিনি হলো মহাসংগীত সাধক স্বামী হরিদাসের সাধনাস্থল এই নিধিবন। কথিত আছে তাঁর সাধনার টানে রাধা ও গোপীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাতে এখানে রাসলীলা করেন। এখনও তাই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে নিধিবনে সকলের প্রবেশ নিষেধ। শোনা যায়, নিষেধ অমান্য করে সন্ধ্যার পর এখানে যারা এসেছে, তারা কেউ হয়েছে উন্মাদ? আবার কেউ-বা গেছে মারা। যুক্তিবাদীরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা উচ্চশক্তির যন্ত্র বসিয়েও এ রহস্য ভেদ করতে পারেননি। রাতের ওই সময়ের সব কিছুই যন্ত্রে থাকে অধরা।

এই নিধিবনে আছে স্বামী হরিদাসের আরাধ্য রাধাকৃষ্ণ মন্দির। বিশ্বাস, নৃত্য শেষে এখানেই রাধা-কৃষ্ণ নেন বিশ্রাম। এখানে আছে রংমহল নামে আরেকটি মন্দির। ওই মন্দিরেই নাকি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাজান শ্রীমতী রাধাকে।

সব মিলিয়ে ব্রজভূমের রাস উৎসব এক কথায় মহামিলনের উৎসব, প্রেমের উৎসব। অবশ্য শুধু ব্রজভূমি নয়, ভারতভূমি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমে আকুল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন প্রেম-প্রীতির বার্তা---না জানা এক সময় থেকেই। ▯

এই আগুন নেভার পর ভস্ম ছাড়া কিছু থাকবে না

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০২১। পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালিরা যখন বছরকার চারদিন আনন্দে মাতোয়ারা, প্রতিবেশী বাংলাদেশে তখন বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো পূজা রক্তাক্ত। অবশ্য দুর্গাপুজো উৎসব হিসেবে যতই নজরকাড়া ও বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম হোক না কেন, পৃথিবীতে ও এই উপমহাদেশেও মোট বাঙ্গালি জনসংখ্যার ধর্মীয় মানচিত্র অনুযায়ী পুজো হিসাবমতো বাঙ্গালির ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীর উৎসব, যারা ক্রমশ আরও ক্ষুদ্র হয়ে বিলয়ের পথে এগোচ্ছে। অধিকাংশ বাংলাভাষী বা বলা ভালো বঙ্গবাসীর উৎসবের মর্যাদা ইদ, মহরম, মিলাদ-উদ-নবি প্রভৃতি কেড়ে নিয়েছে। যে এই উৎসবগুলোর সৃষ্টি সুদূর মরুদেশে, সেগুলোর অনুসারীরা বাঙ্গলাবাসী হলেও প্রকৃত বাঙ্গালি কিনা, সে তর্কে আপাতত যাওয়ার অবকাশ নেই। কারণ বাঙ্গালির চিরাচরিত ধর্মীয় উৎসব বাঙ্গলারই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে শুধু বিধ্বস্তই হয়নি, হয়েছে লুঠপাট, ধর্ষণ, প্রাণহানি, ঘর পোড়ানো, বাস্তুচ্যুতি ইত্যাদির উপলক্ষ্যও। বস্তুত 'হয়েছে' বললেও ভুল হয়, হয়ে চলেছে, যে আগুন নিভতে নিভতে ভস্ম ছাড়া কিছু থাকবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

ঘটনার সূত্রপাত সামাজিক মাধ্যম এবং পরে গুটিকতক মিডিয়ার মাধ্যমে সবার জানা। কুমিল্লার একটি দুর্গামণ্ডপে হনুমানের কোলে একটি 'পবিত্র' কোরান আবিষ্কার হয়েছে। তাতে নাকি 'পবিত্র' গ্রন্থের অবমাননা হয়েছে; তাই ১৩ অক্টোবর মহাঅষ্টমীর দিন কুমিল্লার নানুয়া দিঘি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে চকবাজার এলাকায় (কাপুড়িয়াপট্টি) শত বছরের পুরোনো চাঁদমণি রক্ষাকালী মন্দিরে সকাল ১১টায় প্রথম হামলা দিয়ে পবিত্রকরণ কর্মসূচি শুরু হয়।

'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'-এর কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লা ছাড়াও ওই একই দিনে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, গাজিপুর, কুড়িগ্রাম, মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, ভোলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারেও পুজো মণ্ডপ ও হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি হামলা হয়েছে। হামলা ও লুঠপাটের উল্লাস ওই দিনেই থেমে থাকেনি। ১৪ অক্টোবর বান্দরবান ও নোয়াখালির বেগমগঞ্জে, ১৫ অক্টোবর নোয়াখালির চৌমুহনী ও চট্টগ্রামে পুনরায় ভয়ংকর হামলা হয়েছে। ১৬ অক্টোবর শনিবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজার তিন দিনে কমপক্ষে ৭০টি পূজামণ্ডপে হামলা-ভাঙচুর- লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। মণ্ডপ ও মন্দির ছাড়াও বহু হিন্দু বাড়ি ও দোকানেও অনুরূপ তাণ্ডব চালানো হয়েছে। 'তাণ্ডব' শব্দটা প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করলে আসলে অপপ্রয়োগ হয়ে গেল। কারণ তাণ্ডব নেচেছিলেন পত্নীবিরহে কাতর ও হিতাহিত জ্ঞান হারানো স্বয়ং মহাদেব, কোনও খুনি ধর্ষক নয়।

যাইহোক, পরের দিন ১৫ অক্টোবর শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর 'মালিবাগ মুসলিম সমাজ'-এর ব্যানারে ঢাকার বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের করে কয়েকশো মানুষ। ১৬ অক্টোবর বাংলাদশের ব্যানারে প্রায় দশ হাজার মুসলমান বায়তুল মোকাররমের সামনে বিক্ষোভ করেন। পুলিশের টিয়ার সেল ও শটগান সহকারে প্রতিরোধেও কোনও হতাহত হয়নি উন্মত্ত জনতার মধ্যে।

মন্দিরে-মণ্ডপে হামলার প্রতিবাদে 'কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ'-এর আহ্বানে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেওয়া হলে ফেনিতে সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি চলার সময়ও হামলা হয়। এরপর চলে শহরে

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, আরও কিছু মন্দির ও হিন্দু মালিকানাধীন বেশকিছু দোকানপাটে ভাঙচুর, যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা। বিকেল ৪-৩০ থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ফেনিতে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। ১৭ অক্টোবর রাতে রংপুরের পীরগঞ্জের এক হিন্দু তরুণের ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে রামনাথপুর ইউনিয়নে জেলেপল্লীর হিন্দু পরিবারগুলির ওপর হামলা করে ঘরে লুঠপাট, ভাঙচুর ও শেষে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করা হয়। সংবাদ সংস্থা 'বাসস'-এর কাছে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ৫৮৩ জনকে গ্রেপ্তার ও ১০২টি মামলা হয়েছে। অসংখ্য ছোটো-বড়ো ঘটনা, বর্ণনা দিতে গেলে 'লজ্জা'-র সিকোয়েল লিখতে হবে। শুধু ভাঙচুর লুঠপাট নয়, হয়েছে বেশ কিছু খুন ও গণধর্ষণের মতো ঘটনাও যার জেরেও একটি দশ বছরের বালিকার মৃত্যু হয়েছে। তার মা ও ঠাকুমাকেও একই ঘরে একই দল গণধর্ষণ করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফেলে যায়। তাঁরা বেঁচে আছেন কিনা জানা নেই। পুজোর ক'দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নোয়াখালি-সহ একাধিক জায়গায় নতুন করে হিন্দু নিধনের সংবাদ পাওয়া গেছে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, এক প্রসূতিকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধর্ষণে মত্ত ছিল। ভুক্তভোগী সমাজের এবং গুটিকয় ব্যতিক্রমী নিরপেক্ষ সংবাদাতারা ক্লান্ত হয়ে গেলেও ঘটনার ধারাবাহিকতা এখনও থামেনি। এই লেখা প্রকাশ পেতে পেতে মৃত, ধর্ষিত, বাস্তুচ্যুত এবং ফলত ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোনও ধারণা নেই। নিত্য আপডেট পেতে মুখপুস্তক ও হোয়াট্স্অ্যাপ অনুসরণীয়, কারণ নিখাদ সত্য হোক-বা অতিরঞ্জিত— খবর যা পাওয়ার সেখানেই মিলবে; মূল স্রোতের মিডিয়ার তো হামলা শুরুর ১৩ দিন পরেও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি, সবে হাই উঠছে।

এবার আবার পিছিয়ে একটু গোড়া থেকে আরম্ভ করে কতগুলো প্রশ্ন ঝালিয়ে নিই।

(১) পুজোমণ্ডপ থেকে কোরান উদ্ধার করেন কোতোয়ালি থানায় ওসি আনোয়ারুল আজিম। কিন্তু খবরে প্রকাশ, পুজোর উদ্যোক্তারাই ওসি সাহেবকে খবর দিয়েছিল মণ্ডপে কোরান আছে বলে। তা তিনি তেনাদের পাক কেতাব উদ্ধার করার পরেও কীভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল? খবরটা কি পুলিশ প্রসাসনই দায়িত্ব নিয়ে ধর্মান্ধ জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল?

(২) শৌচাগারে নয়, আস্তাকুঁড়ে নয়, মানুষের পায়ে নয়; কোরান পাওয়া গিয়েছে দেবীর মণ্ডপে একটি মূর্তির কোলে। তবুও ওই পুস্তকটি অপবিত্র হয়ে গেল? কোনও কোনও মণ্ডপে তো মোল্লাদের দ্বারা আজানও দেওয়া হয় শুনেছি। দুর্গা মণ্ডপে আজান হলে আজান অপবিত্র হয় না, আর কোরান রাখা থাকলে কোরানের অবমাননা হয়ে যায়? কী বিচিত্র ধর্মবোধ!

(৩) এই প্রথম দুর্গা পুজোয় আক্রমণ হয়নি। এই মূর্তি ভাঙা, পুজো পণ্ড, হিন্দু বাড়ি লুঠপাট বাংলাদেশে একটি বার্ষিক উৎসব। বস্তুত সারা বছরই অল্পবিস্তর চলতে থাকে। আগে সোশ্যাল মিডিয়ার অভাবে সব খবর পাওয়া যেত না। যারা গড়তে জানে না, নষ্ট করেই তাদের সুখ; কারণ কাজটা সহজ এবং সাফল্য তাৎক্ষণিক ও নিশ্চিত। এই ঘটনাক্রম ২০১৪-য় ভারতে বিজেপি সরকার আসার পর দিনে দিনে মাত্রাছাড়া হয়েছে। ভারত সরকারের নেকনজরে থাকা হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারের প্রশাসন খুব ভালো করেই এসব জানে। প্রতিটি মণ্ডপেই তাই নাকি পুলিশি নিরাপত্তা থাকে। এখন পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছিল, না সন্ত্রাসীদের উস্কানি? আর সেটা কি প্রধানমন্ত্রীর অমতে সম্ভব? ভারতের মতো দেশে পুলিশ রাজ্যের অধীনে বলে রাজ্যে রাজ্যে বিবিধ ছবি। কিন্তু বাংলাদেশের মতো পুঁচকি দেশে কটা রাজ্য আছে?

(৪) মূর্তির কোলে কোরান সাজিয়ে রাখার মতো আত্মঘাতী কাজ যে হিন্দুরা করেনি, তা জানা কথা। তবু তিনদিন ধরে তছনছ চলল। তারপর আবিষ্কৃত হলো ইকবাল হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তি যে কোরান রেখেছে। তাকে ও পরে আরও দু'জন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। সে নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন, পরিবার বিচ্ছিন্ন নেশাখোর। সে পাগল বা সেয়ানা যাই হয়ে থাক, কিন্তু সে বা তার সহযোগীরাই কি শুধু ষড়যন্ত্র করেছে? তাহলে দেশজুড়ে গুজব ছড়িয়ে হিন্দু নিষ্পেষণে দলে দলে মেতে উঠল কারা? কেনই-বা সংবাদমাধ্যম সংবাদ চেপে রেখেছিল? কেন হামলার খবর প্রকাশ ও প্রচারে 'সংযমী' থেকে তারা নির্যাতন, লুঠপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে নির্যাতনের বলিরা আরও বেশি নির্যাতনের মুখে পড়ে? চাঁদপুরে ৪ জন ও অন্যত্র আরও একাধিক ব্যক্তির হত্যার ঘটনা, নোয়াখালি ও রংপুরে বর্বরতার চিত্র কেনই-বা চেপে যাওয়া হয়? স্পষ্টত বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সংখ্যাগুরুর আচরণই করেছে। সর্বোপরি, সংবাদ পাওয়ার পরেও অরাজকতা দমনে সরকারের পদক্ষেপ নিতেই-বা এত দেরি হলো কেন যে সুযোগে হামলাকারীরা নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে পেরেছে?

(৫) নোয়াখালির চৌমোহনীতে জুম্মার নামাজের ঠিক আগে মন্দিরে হামলার সময় পুলিশ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। যারা মন্দির লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করছিল, তারা সবাই ওই এলাকার পরিচিত মুখ। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের তারা চেনে, কিন্তু ভয়ে নাম প্রকাশ করতে পারছে না। কারণ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় তাদের আশঙ্কা যে, হামলাকারীদের নাম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করলে অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। (সূত্র : একাত্তর টিভি)। প্রশ্ন : মন্দিরে আক্রমণের সময় এলাকাবাসী দুর্বৃত্তদের চিনতে পারলেও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কেন পারেনি? ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সরকারের তরফে উদারতা সহিষ্ণুতা নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো বুলি শোনা গেল। কিন্তু সেসব বুলি প্রশাসন বা হামলাকারীর কেউই পাত্তা দিচ্ছে না। তাহলে দেশ চালাচ্ছে কারা? সরকার কি তবে ব্যর্থ, নাকি এইসব কিছুর মধ্যে সরকার দলের লোকেদেরও হাত আছে?

(৬) দেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর যে নৃশংসতা নোংরামো, ধ্বংসলীলা, জমিদখল চলল, তার দায় কি শুধু ইকবাল ও তাকে ব্যবহার করা দুজন মোল্লার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়? আর প্রতিমার কোলে কোনও ধর্মগ্রন্থ থাকলে সেটা তো সেই বইটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। তাকে কেন্দ্র করে এমন হিংস্রতা পুর্ব প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব? একটা পরিকল্পিত এথনিক ক্লিনজিংকে একজন ইয়াবা খোরের কীর্তি হিসেবে চালিয়ে কি সরকার নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে না?

বাংলাদেশ সরকার যে নিজেদের ব্যর্থতা বা সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তা প্রত্যাশিত। কিন্তু তার লাগোয়া এই বাঙ্গলাতে সরকারের তরফে এই ধারাবাহিক ও চরম বর্বরতাকে নিন্দা করে কিছু বলা হয়েছে কি? কী করে হবে? সেখানেও তো একই প্রক্রিয়া

চলেছে যেখানে সংখ্যাগুরু নয় তথাকথিত সংখ্যালঘুরাই যে কোনও অপরাধ করার লাইসেন্স নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘোরে। এই পরিস্থিতিতে ফেসবুকে বুদ্ধিজীবীদের 'সিলেক্টিভ কান্না' সিরিয়ালে ঠিক দেড় দিন ধার্য হয়েছে সনাতনীদের নামে নাকি কান্নার পর্বের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের কবি-লেখকরা বাংলাদেশে শান্তিরক্ষার আবেদন করতে গিয়ে এত কাণ্ডের পরেও মুজিব ও হাসিনার গুণকীর্তন আর সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য ভারতের অর্থাৎ হিন্দুদের প্রধান দায় স্বীকার করছে, যাতে করে নিজেদের বাংলাদেশ সফর অব্যাহত থাকে, আবার মুসলমান ভোট নির্ভর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও সন্তুষ্ট রাখা যায়।

জাতীয়তাবাদী রিপাবলিক বাংলা থেকে মৌলবাদী এবিপি আনন্দ— সর্বত্র আমন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের মতে ভারতেও নাকি অনুরূপ ঘটনা ঘটে মুসলমানদের সঙ্গে! এর চেয়ে মিথ্যে আর কী হতে পারে? কিন্তু বুদ্ধিজীবী নামাঙ্কিত প্রাণীগুলোর কাছে এটাই প্রত্যাশিত। কারণ তাদের আদালতে গুজরাট কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, কিন্তু গোধরা কাণ্ড বেকসুর খালাস পায়। ভারতে যে কখনও অকারণে একতরফা সংখ্যালঘু নিধন হয় না, তা এঁদের খুব ভালো করে জানা। সংখ্যালঘুরা মার খেয়ে আত্মরক্ষার জন্য পালটা দিলেই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুরা ভিক্টিম কার্ড খেলা শুরু করে শোরগোল ফেলে দেয় তো এঁদেরই প্রত্যক্ষ মদতে।

আসলে হিন্দুত্বের সঙ্গে বাঙ্গালিত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা অস্বীকার করার প্রস্তুতি চলেছে বহুদিন ধরেই। বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে দুটি পথ খোলা—হয় জেহাদের আগুনে ঝলসে মরো, নতুবা দলে দলে ধর্মান্তরিত ধর্মোন্মাদে পরিণত হয়ে বাঙ্গলা ও ইসলামের অভিন্নতা প্রমাণ করো। এভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে হিন্দুধর্মে দেওয়া নারীর প্রতীকী শক্তির রূপটিও। মাতৃপুজার সঙ্গে বাঙ্গালির আবেগ অধিকতর সম্পৃক্ত হলেও ভারতের বাকি হিন্দুদের কি ছিটেফোঁটাও নেই? অবশ্যই আছে। নাহলে জম্মুর বৈষ্ণোদেবী থেকে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষী মন্দির পর্যন্ত এত ভক্তের ভিড় হতো না। ভারতবর্ষ তো বটেই, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল জুড়ে, তীব্বত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের কয়েকটি স্থানে, এমনকী চীনেরও এক স্থানে রয়েছে শক্তিপীঠ। এগুলো গড়ে উঠেছে সতীমাতার দেহের বিভিন্ন অংশ পড়েছে,

বাঙ্গালি হিন্দু তো কাশ্মীরি হিন্দুদের জন্যও গলা ফাটায়, পাকিস্তান আফগানিস্তানের অবাঙ্গালি হিন্দুদের জন্যও কাঁদে। তার বিপর্যয়ে একবারের জন্য কি পুরো ভারতবর্ষ দীপ নিভিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদেও পাশে দাঁড়াতে পারে না?

এই পৌরাণিক আখ্যান আশ্রয় করে। আমি তো বলি, 'শক্তিপীঠ যেখানে হিন্দুভূমি সেখানে; সতীপীঠ যতদূর ভারতবর্ষ ততদূর।' শিবের চরণস্পৃষ্ট ও মহামায়া আদ্যাশক্তির দেহাংশ ধন্য বলেই দেশকে আমরা 'মাতৃভূমি' বলি। এই বিস্তীর্ণ পুণ্যভূমির অধিকাংশ জুড়েই আজ স্বয়ং জগন্মাতার লাঞ্ছনা চলেছে, শিবের অসম্মান হচ্ছে। এভাবে তো পুরাণ ও প্রাচীন দর্শন আধারিত মাতৃ উপাসনাই হিন্দু সংস্কৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে প্রকৃত বাঙ্গালি জাতিসত্তাও। আর সেটা হলে ধস নামবে ভারতীয় সংস্কৃতিতেও। মধ্যযুগে বিধ্বস্ত হিন্দু সমাজে প্রথম সুসংস্কার এসেছে বাঙ্গালি মহাপুরুষদের হাত ধরেই। এসেছে জাতীয়তাবোধও।

কিন্তু আজ বাঙ্গালি মনীষার সিংহভাগ জেহাদের উর্বর জমি। অবশিষ্টদের মধ্যেও একটা অংশ বুদ্ধিজীবী তকমা পেয়ে বিকারগ্রস্ত। প্রত্যাশিতভাবেই তারা ধর্ষক ও ধর্ষকামী মতবাদের হয়ে সাফাই গেয়ে বাঙ্গলাকে আরবের হারেমে পাঠিয়ে শান্তিরক্ষার অভিনয় করছেন। এদের কাছে সত্যিই কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু যাদের কাছে আশা করা যায়, তাদের ভূমিকা কী? ব্যাপক হিংস্রতা ও হিন্দু হত্যালীলার জেরে পশ্চিমবঙ্গের অতি সহনশীল হিন্দুদেরও সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ চাপা থাকেনি। কিন্তু তাই দেখে হাসিনা আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভারতে যেন এই হিংসার কোনও প্রতিক্রিয়া না হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবশিষ্ট হিন্দুদের তার ফল ভোগ করতে হবে; এই স্পর্ধার কোনও জবাব কি আমাদের শক্তিশালী সেনা সমন্বিত সুবিশাল দেশের সরকারের কাছে নেই?

বিদেশনীতির সৌজন্যে বাংলাদেশ ভারতের সরকারের কাছে শতসহস্র উপহার উপঢৌকন ও বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করার পরেও সেখানে ধারাবাহিকভাবে হিন্দু হত্যা ও বাস্তুচ্যুতি চালিয়ে যাচ্ছে, যার জেরে এই ভারতেই শরণার্থীর চাপ বাড়ছে। জানি না বাংলাদেশের মুসলমানদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে না জেনেও সমস্যার সমাধান হবে কিনা। তবে সবরকম বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে বাংলাদেশ যতটা চাপে থাকবে, ভারতেরও কি ততটা ক্ষতি হবে? বাংলাদেশকে স্বাধীন থাকতে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, বরং চীনের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ খোলা থাকবে। ভারতের একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল দ্বারা গঠিত কেন্দ্র সরকারের কাছে বিষয়টি নিয়ে ভাবার আবেদন রইল।

বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা নতুন কিছু নয়। যে দেশটাকে স্বাধীন করতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালির প্রাণ গেছে, সেই দেশ থেকে এমন বিশ্বাসঘাতকতা হিংস্রতা পেতে পেতে অভিমানের চরমে পৌঁছে বাংলাদেশের হিন্দুরা স্থির করেছে, এ বছর দীপাবলীতে তারা আলোর উৎসব করবে না। তাতে ক্রমশ তালিবানপন্থা গ্রাস করা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা তথা সরকারের বয়েই গেছে। তারা তো এটাই চায়। কিন্তু সঙ্গত সহমর্মিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের পক্ষে আপামর হিন্দুদের কাছে আবেদন করা হয়েছে, এ বছর পশ্চিমবঙ্গেও দীপাবলীর আলোকসজ্জা বর্জন করে নিজেদের বাড়ির নীচে যথোপযুক্ত পোস্টার লাগিয়ে কারণটা মানুষকে জানিয়ে দিতে।

খুব সংবেদনশীল প্রস্তাব। সঙ্গে একটি প্রশ্ন আমিও রাখছি : বাঙ্গালি হিন্দু তো কাশ্মীরি হিন্দুদের জন্যও গলা ফাটায়, পাকিস্তান আফগানিস্তানের অবাঙ্গালি হিন্দুদের জন্যও কাঁদে। তার বিপর্যয়ে একবারের জন্য কি পুরো ভারতবর্ষ দীপ নিভিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদেও পাশে দাঁড়াতে পারে না? ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্যও তো এই হিন্দু বাঙ্গালিরাই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। □

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অভিবাসী নারী

সুদীপ কুমার আচার্য

১৯৪৭-এ ভারত বিভাজনের পর পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে উদ্বাস্তু জনতার অসহায় অভিপ্রয়াণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়, যার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে ছিল সর্বাধিক। এসময় প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে চলে আসেন এবং এদের মধ্যে ৪৬.২১ শতাংশ ছিলেন মহিলা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণ অভিশাপের আকার ধারণ করে। যার মূল কথা ছিল মুসলমান সংখ্যাগুরু দেশে হিন্দুর নিরাপত্তা নেই। ১৯৪৬-এর নোয়াখালি পৈশাচিকতাকে স্মরণে রেখে তৎকালীন অনেক হিন্দু পরিবারের কাছেই মানসম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে, একরাশ বেদনা বুকে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। আর বাস্তবেও ভারতবর্ষ থেকে গান্ধী বা নেহেরু যতই স্তোকবাক্য দিন না কেন, ১৯৫০-এর দশকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িকতার কালোছায়া নেমে আসছে। একটি হিসাবে দেখা গেছে, এসময় উদ্বাস্তু অভিপ্রয়াণের সংখ্যা ছিল ১.৫ মিলিয়ন।[১] ১৯৬২ সালে রাজশাহী-পাবনায়, ১৯৬৪ তে খুলনায় বহু হিন্দু পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল।[২] এরপর ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন ইতিহাস আমাদের দেখালো তিন লক্ষ হিন্দুর হত্যা এবং চার লক্ষ মহিলার ওপর বর্বর নির্যাতন। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে কোনো স্বাধীনতা দিতে নয় বরং ভৃত্যসম চাটুকার রূপে দেখতে চেয়েছিল একথা সবাই জানেন। একইভাবে বেদুইন কালচার এনে বাঙ্গালি সংস্কৃতির খোলনলচে পালটে দেওয়ার অসাধু উদ্দেশ্য তাদের ছিল। ঠিক এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন হয় কিন্তু পাকিস্তানি মিলিশিয়ার কাছে এসব ব্যাপার ছিল বুদবুদের মতো। ভারতীয় সেনা যদি বলিদান না দিত এবং ভারতীয় তথা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির বহুমাত্রিক অবদান ও সমর্থন যদি না মিলত তবে বোধ করি দক্ষিণ এশিয়ার এই অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটিতে এত দ্রুত স্বাধীনতার সূর্য উঠত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের এই অবদান আজ বিস্মৃতপ্রায়। পাশপাশি, ১৯৭১-এ শেখ মুজিবুর যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সামনে রেখে জাতি তথা বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার করেছিলেন তা আজ কতটা অবশিষ্ট আছে সন্দেহ জাগে। উদাহরণ হিসাবে এবছর দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ২২ জেলায় যে গোলমাল হল তাকে সামনে রাখা যায়। খবরে প্রকাশ বাংলাদেশের প্রায় ৩২ হাজার দুর্গাপূজা হয় কিন্তু এজন্য আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে এই একবিংশ শতকে এসে কেন পুলিশ প্রহরার বন্দোবস্ত করতে হয় তা বোধগম্য হয় না। এছাড়া সংখ্যালঘু নারী নির্যাতন তো আছেই।[৩] সংখ্যালঘু বিতাড়নের ঘটনাও ঘটে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৭৪–১৯৮১ সালের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ সংখ্যালঘু বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে। ১৯৯১ ও ২০০১ সালের ভারতবর্ষের আদমসুমারি পরোক্ষে একথার প্রমাণ দেয়। কেননা এসময়েই পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তের জেলাগুলিতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল।[৪] ২০১৩ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু সংখ্যালঘু পরিবারগুলির ওপর ৩,৬০০টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টগুলি এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে বললাম এই কারণে যে, এর সঙ্গে অভিবাসনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। অনিশ্চয়তা, অসহায়তা, আর্থিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, পরিবারের ওপর আক্রমণ, শান্তিপূর্ণ জীবনে অকস্মাৎ আঘাত এলে পরিবারসহ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং অন্য দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করেন। গত ২০ বছরে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এমন বেশ কয়েকটি পরিবারকে আমি দেখেছি এবং ওই অভিবাসী পরিবারগুলির মহিলাদের সঙ্গে গবেষণার প্রয়োজনে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত, অধিকাংশ গবেষক একমত হবেন যে, বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল হিন্দু পরিবার ছিলেন (বৈদ্য, কায়স্থ, নমঃশূদ্র), তাঁদের ছিল এক সুন্দর স্থায়ী জীবন। কিন্তু মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে সেইসব পরিবারের লোকেদের প্রাণ নিয়ে চলে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এক নতুন জীবন শুরু করতে হয়। এরকমই অভিবাসী পরিবারগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নদীয়া, দুই

দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। ২০১১ জনগণনা অনুসারে ভারতে ৩০ লক্ষ অভিবাসী আছেন যার ৯৮ শতাংশ বাংলাদেশি (এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ হলেন মহিলা)।[৫] অভিবাসী পুরুষরা যেমন জীবন জীবিকার তাগিদে নানান পেশা গ্রহণ করেছেন পাশাপাশি অভিবাসী নারীরাও রং শ্রমিক, সবজি ও মাছ বিক্রেতা, বাড়ির কাজের আয়া এবং বিভিন্ন জিনিস ফেরি করার কাজ করেন। কৃষিক্ষেত্রে নগণ্য হলেও এদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল এবং শহরের কারখানাগুলিতে এদের সস্তা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে দেখা যায়। অভিবাসী মহিলাদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজে অংশগ্রহণের ফলে নৃতাত্ত্বিক, সংখ্যাগত, ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য হলেও কিছু বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার একটা বৃহত্তর অংশই এ অভিবাসনের সাক্ষী এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে এই মহিলাদের অধিক সংখ্যায় বাস করতে দেখি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে নানান কুটিরশিল্প যেমন, বিড়ি শিল্প, তাঁত শিল্প, মাদুর, মোমবাতি শিল্প, কাঁথা শিল্প, গেঞ্জি কারখানা ও কুমোরের কাজকর্ম ইত্যাদির সঙ্গে এরা যুক্ত। এই মহিলারা কেমন জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত তা বুঝতে গেলে আগ্রহী পাঠক মরিচঝাঁপিতে মহিলাদের বাস্তু নির্মাণ ও পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার বিষয়টিকে মডেল হিসাবে ধরে একটা সংক্ষিপ্ত প্রতি তুলনা করে নিতে পারেন।[৬]

যাইহোক, প্রাথমিকভাবে অভিবাসী মহিলাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে এদেশে চলে আসা (স্বামী বা পরিবার সহ, কখনও একলা) প্রচণ্ড সমস্যার এবং এককথায় দুঃসহ ছিল। এর নেতিবাচক দিক আরও বেদনার। কেননা, বিভিন্ন পাবলিক রিপোর্ট তথা সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই বাংলাদেশি নারী বা শিশুদের ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে পাচার, মাদক দ্রব্য চোরাচালানে অংশ নেওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি, হোটেল রেস্টুরেন্টে সস্তা শ্রমিক অথবা পতিতাবৃত্তির কাজে লাগানো হয় বলে প্রতিবেদনে দেখা যায়। কখনও কখনও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে বা সোনা পাচার অথবা সন্ত্রাসমূলক কাজে তাদের ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী মহিলা হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিম মহিলারাও অল্প সংখ্যায় এসেছেন। কিন্তু হিন্দু বৌদ্ধ মহিলারা বেশিরভাগই সংখ্যালঘু নির্যাতনের কবলে পড়ে ঘর ছেড়েছেন। সামাজিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা সুরক্ষিত বোধ করেন। পরবর্তী প্রজন্মকে মানুষ করার জন্য প্রশাসনের সাহায্য এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় তারা বুক বাঁধেন। তবে, অভিবাসী নারীদের নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা তথ্যের অপ্রতুলতা। NRC বা রোহিঙ্গা বলে দাগিয়ে দেওয়ার ভয়ে অনেক অভিবাসী পরিবারের মহিলারা পরিচয় দিতে ভয় পান। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ যা ২০২১ এ এসে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে বলা হয়। কিন্তু জনসংখ্যা বিবর্তন বা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হ্রাসের গতিবৃদ্ধি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তাতে এ সংখ্যা আরও কম। আর ভারতীয় সেনসাস রেকর্ড দেখলে এই মাইগ্রেশনের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে সেনসাসে (১৯৭১-২০০৯ পর্যন্ত) প্রায় ৮ মিলিয়ন জনসংখ্যাকে মিসিং পপুলেশন বলে দেখানো হয়েছে। আর পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার এই অভিবাসীদের নিজেদের নাগরিক বলে স্বীকার করেন না। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে হয় অভিবাসী মহিলা ও তাদের পরিবারবর্গ পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও জনসংখ্যার মূল ধারায় মিশে গেছেন এবং এই আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় তারা যথেষ্ট সদর্থক ও মানবিক ব্যবহার পেয়েছেন যা তাদের বিকাশ ও উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। সবশেষে মনে করি যেহেতু অভিবাসী নারীসমাজ মানব সম্পদ হিসেবে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিকাঠামো বিকাশে ন্যূনতম অবদান রাখছেন এবং সমাজ সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাই তাদের দিকে জরুরি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নারীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নগুলিকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভেবে দেখা এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ঃ ১। ইয়ান ট্যালবট, দ্য ১৯৪৭ পার্টিশন অ্যান্ড মাইগ্রেশসন এ কম্পারেটিভ স্ট্যাডি অফ পাঞ্জাব অ্যান্ড বেঙ্গল (রিচার্ড বেসেল এবং ক্লদিয়া হেক সম্পাদিত গ্রন্থ-রিমুভিং পিপলস ফোর্সড রিমুভাল ইন দ্যা মডার্ন ওয়ার্ল্ড নামক গ্রন্থে প্রদত্ত গবেষণা), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯, পৃষ্ঠাঃ ৩২১-৩৪৭। ২। ডা. মৃণালকান্তি দেবনাথ, জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে, বুক বাজার, কলকাতা-৭০০০৩২, নভেম্বর ২০০৮, সম্পূর্ণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ৩। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশন, লাইফ ইজ নট আওয়ারস ঃ ল্যান্ড অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ইন দ্যা. সি. এইচ. টি. অফ বাংলাদেশ, আর্মসস্ট্রাডম থেকে প্রকাশিত, ২০০০, আরও দ্রষ্টব্য, মেই উলফগ্যাং, জেনোসাইড ইন দ্যা সি.এইচ.টি., কোপেনহেগেন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-২৮। আরও দ্রষ্টব্য, সফি আহমেদ ও পূরবী বসু সম্পাদিত এখনও গেল না আঁধার, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৬-১৮, ২২-২৩, ৪১০-৪১৩। ৪। বিমল প্রামাণিক, এনডেনজারড ডেমোগ্রাফি, কোলকাতা, ২০০৫, সম্পূর্ণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এছাড়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ঃ তথ্য ও দলিল, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১২৬। ৫। সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৭১, মাইগ্রেশন টেবিল P(II)-D-(i), সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৮১, মাইগ্রেশন টেবিল, পার্ট V(A & B), সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৯১, মাইগ্রেশন টেবিল, D-2, সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ২০০১, ২০১১, মাইগ্রেশন টেবিল, D-2, জাতীয় জনসংখ্যা গণনাপঞ্জী, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি। আরও দ্রষ্টব্য-সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ২০১১, প্রাইমারি সেন্সাস অ্যাবস্ট্রাক্ট, ডেটা হাইলাইটস, ড. সি. চন্দ্রমৌলি, রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স, ৩০শে এপ্রিল, ২০১৩, সংগম বুক ডিপো, নিউ দিল্লি। ৬। মধুময় পাল (সম্পাদিত), দেশভাগ ঃ বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাংচিল পাবলিকেশনস, ২০১০, কলকাতা এবং মরিচঝাঁপি ঃ ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, গাংচিল পাবলিকেশনস, ২০১১, কলকাতা।

নবাঙ্কুর

লোভের শাস্তি

সে বহুকাল আগেকার কথা। ব্রহ্মপুত্রের নামে এক ছোটো রাজ্য ছিল। সেখানকার লোকেরা খুব সুখে আর আনন্দে দিন কাটাত। চাষিরা জমিতে ভালো ফসল উৎপাদন করত। সেখানে লোকেদের খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিল না। সেই রাজ্যে মোহন দাস নামে এক চাষি ছিল। সে খুব কষ্ট করে তার জমিতে ফসল ফলাত। কারণ তার জমিগুলো ছিল খুবই রুক্ষ। কিন্তু সে খুব কর্মঠ আর সৎ ছিল।

একবার ভালো বৃষ্টি না হওয়ায় মোহন দাসের জমিতে একেবারেই ফসল হলো না। মোহন দাস শুধু ঈশ্বরকে ডাকে আর ভাবে ছেলে-মেয়েদের মুখে কীভাবে অন্ন তুলে দেবে। একদিন দুপুরবেলা মোহন দাস একটা গাছের তলায় বসে ভগবানকে ডাকছিল, এমন সময় একটি চড়াইপাখি তার মাথায় পায়খানা করে দিল। মোহন দাস তা হাতে নিতেই সেই পায়খানা সোনায় পরিণত হয়ে গেল। সে ভাবল পাখিটিকে যদি ধরা যায় তাহলে আর খাওয়া-পরার চিন্তা থাকবে না। পরদিন মোহন দাস সেই গাছে ফাঁদ পেতে বসে রইল, কিছুক্ষণ পরে পাখিটি ফাঁদে ধরা পড়ল। মোহন দাস আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল। সে তার বউকে বলল এ পাখি ঈশ্বরের দান। তার স্ত্রীও খুব খুশি হলো। পাখির পায়খানা থেকে হওয়া

সোনা বিক্রি করে তাদের আর কোনো অভাব রইল না। তাদের অবস্থাও খুব ভালো হয়ে গেল।

কিন্তু বেশিদিন এমনভাবে গেল না। রাজার লোকেরা বুঝতে পারল যে মোহন দাসের কাছ এমন কিছু আছ যা রাজার সম্পত্তি। সিপাইরা তক্কে তক্কে ছিল। এভাবেই একদিন তারা সেই পাখির খোঁজ পেয়ে গেল। তারা মোহন দাসকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল। — তুমি নাকি এমন একটি পাখি ধরেছ যার পায়খানা সোনায় পরিণত হয়, রাজা জিজ্ঞস করলেন। — বিষয়টা ঠিক তা নয় হুজুর। যখন আমার জমিতে ফসল ফলে না, খুব অভাবে দিন যাপন করি তখনই পাখিটির পায়খানা সোনা হয়ে যায়, আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর,মোহন দাস বলল। — বিশ্বাস করলাম। কিন্তু পাখিটি এই রাজ্যের, তাই এটি রাজসম্পত্তি। আমি এটিকে রাজপ্রাসাদে রাখব, মহারাজ বললেন।

পাখিটিকে জোর করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। খুব আদর যত্ন শুরু হলো। রাজার লোকেরা লক্ষ্য করল পাখিটির পায়খানা সোনায় পরিণত হচ্ছে না। আরও কিছুদিন যাওয়ার পর রাজাকে বলা হলো এই কথা। রাজা রেগে ধৈর্য হারালেন। তিনি মোহন দাসকে ধরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। মোহন দাসকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, পাখিটির পায়খানা তো সোনা হচ্ছে না! — কিন্তু মহারাজ, আমি তো বলেছিলাম যে যখন আমার জমিতে ফসল হয় না, আমার খুব অভাবে দিন যায় তখন পাখিটির পায়খানা সোনায় পরিণত হয়, মোহন দাস বলল। —তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আসল পাখি দাওনি, রাজা বললেন। —আমার বড়িতে তল্লাশি করুন ,তাহলেই বুঝতে পারবেন, মোহন দাস বলল।

মোহন দাসের বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অন্য কোনো পাখি পাওয়া গেল না। রাজার আদেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু রাজার সন্দেহ কাটল না। আর কিছুদিন পরে পাখিটিকেও ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। পাখি উড়ে গিয়ে দূর থেকে রাজাকে বলল, মহারাজ, আমারই পায়খানা সোনায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু আপনার তো অভাব অনটন নেই। মোহন দাসের ছিল, তাই আমি তাকে সোনা দিয়েছি। বিনা কারণে আমায় বন্দি করে রাখলে কোনো কাজেই আসি না। আমি লোভীদের কাছে থাকি না।

মহারাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। মোহন দাসও খুব কষ্ট পেল, এমন পাখি তার হাত থেকে চলে গল।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের বিপ্লবী

জীবন ঘোষাল

জীবন ঘোষাল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক। জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন চট্টগ্রামের সদরঘাটে। তাঁর আসল নাম মাখনলাল। কিশোর বয়সেই বিপ্লবীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াতেন। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর নোয়াখালি জেলার ফেনি রেল স্টেশনে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কিন্তু পুলিশ হাজত থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব পরিচালিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে আহত হয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর।

জানো কি?

- আমেরিকার রাজধানীর নাম তার প্রথম প্রেসিডেন্টের নামানুসারে ওয়াশিংটন ডিসি হয়েছে।
- চীনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে Zhu Zhen Dan (ঝু ঝেন দাঁ)নামে ডাকতেন।
- নরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রথম সম্বোধন করেন ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিংহ ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি বলে সম্বোধন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- ভারতীয় রেলকে ভারতের জীবনরেখা বলা হয়।
- ইংরেজি ক্যালেন্ডারে বার অনুযায়ী এপ্রিল-জুলাই হুবহু এক।

ভালো কথা

কুমারীপুজো

এবার স্বস্তিকার কালীপুজোয় আমি কুমারীপুজোর জন্য কুমারী মনোনীত হয়েছিলাম। পুজোর দিন সন্ধ্যায় মা ও কাকিমারা আমাকে সাজিয়ে দিলেন। মা কালীর পাশে আসনে বসে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্য কোথাও পৌঁছে গেছি। ঠাকুরমশাই ও সকলে আমার পা ধুইয়ে দিয়ে গামছা দিয়ে মুছে আমাকে মিষ্টি ও জল খাইয়ে দিলেন। তারপর আমাকে পূজা করতে শুরু করলেন। তখন আমার এক অন্য অনুভূতি হচ্ছিল। পুজোর পর সকলের ভালোবাসা পেলাম। আমি খুব খুশি। আমি কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি যেন আবার 'কুমারী' হতে পারি।

ঋষিতা দাঁ, দ্বিতীয় শ্রেণী, টি পি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কালো জগতের ভালো

রচনা কুমার, ষষ্ঠ শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

মা কালী খুবই কালো
তবু দেখতে খুবই ভালো।
আমার মা-ও খুব কালো
আমার মা-ও খুব ভালো।
আমিও কালো তবু সবাই বলে ভালো
ঠাম্মি বলে, কালো জগতের ভালো।।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

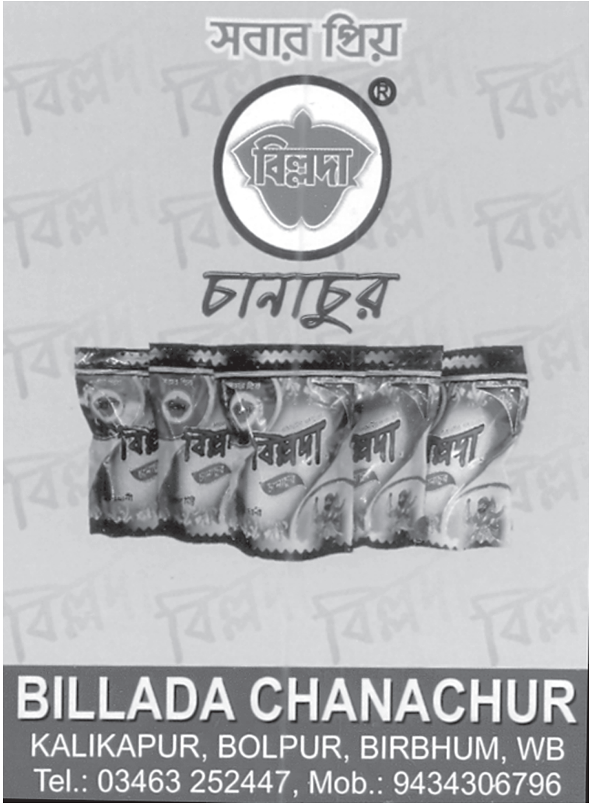

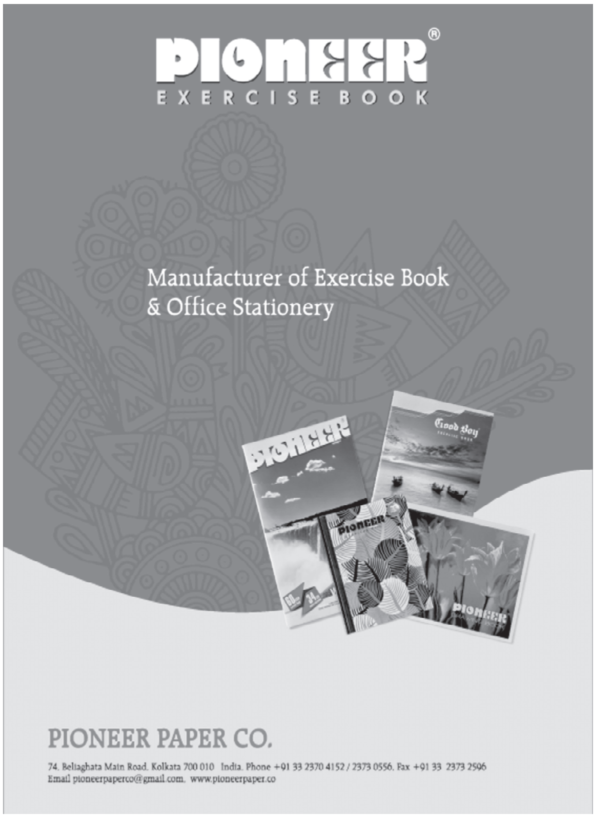

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে ফেলার একটি নিয়মমাফিক ও সংগঠিত প্রচেষ্টা : দত্তাত্রেয় হোসবলে

গত ২৮–৩০ অক্টোবর কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠক সম্পন্ন হয়। বৈঠকে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে বলেন, দেশ স্বাধীনতার অমৃত উৎসব উদ্‌যাপন করছে। এই উদ্দেশ্যে, সংঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজ এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতায় কাজ করবে এবং অনুষ্ঠানগুলিও স্বাধীনভাবে সংগঠিত হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অজানা যোদ্ধাদের জীবন সমাজের সামনে তুলে ধরা হবে। উদাহরণস্বরূপ, আন্দামানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই, এই ধরনের লোকদের জীবন নিয়ে প্রদর্শনী, তামিলনাড়ুর ভেলু নাচিয়ার, কর্ণাটকের আবক্কা, রানি গাইদিনলিউ এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সম্পর্কে জানা নেই, সমাজে এই ধরনের লোকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা তুলে ধরা হবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ্বের মধ্যে অনন্য, যা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আন্দোলনে দেশের ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই আন্দোলন শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল ভারতের 'স্ব' অর্থাৎ স্ব-ন্ত্রত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তাই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্ব-ভাষার আন্দোলন, স্ব-সংস্কৃতির আন্দোলন। সেজন্য ভারতের 'স্ব' মানে, ব্রিটিশদের এখান থেকে তাড়ানো শুধু নয়। স্বামী বিবেকানন্দ সহ অনেক ব্যক্তিত্ব ভারতের আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য কাজ করেছেন। এছাড়াও, এই উপলক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের একটি অঙ্গীকার নেওয়া উচিত যে আমরা বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতকে শ্রেষ্ঠ করার জন্য কাজ করবো।

নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর চারশোতম জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে একযোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুরু তেগবাহাদুর ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁর স্মৃতি ও অনুপ্রেরণা বর্তমান প্রজন্মের কাছে জানান উচিত।

তিনি বলেন যে, কার্যনির্বাহী সমিতি বছরে দুবার বৈঠক করে। প্রতিনিধি সভার আগে এবং দীপাবলি ও দশেরার মধ্যে। এখন অনুষ্ঠিত বৈঠকটি তিন দিনের বৈঠক। গত বছর করোনার কারণে সভা হতে পারেনি। করোনার সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা লক্ষাধিক সেবামূলক কাজ করেছেন। করোনার কারণে সঙ্ঘের কাজ সম্প্রসারণও ব্যাহত হয়েছে, সঠিকভাবে শাখা করা যাচ্ছে না। স্বয়ংসেবকদের প্রবাস, সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাহত হয়েছে। শাখা আকারে সরাসরি কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেবার কাজ ব্যাপক হয়েছে। নিয়মিত শাখায় আসা স্বয়ংসেবকদের পাশাপাশি শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের জন্য আসা স্বয়ংসেবকরাও খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর তৃতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে

ফ ঃ ৬

প্রতিটি রাজ্য মোকাবিলার প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে তৃতীয় ঢেউয়ের পরিস্থিতি আসে, তাহলে সমাজের সহযোগিতায় আমরা তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকব। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তবে তৃতীয় ঢেউ এলে আমরা প্রস্তুত।

বর্তমানে দৈনিক শাখা ৩৪ হাজার স্থানে, সাপ্তাহিক মিলন ১২৭৮০ স্থানে, মাসিক মণ্ডলী ৭৯০০ স্থানে অর্থাৎ ৫৫ হাজার স্থানে সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কাজ রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৫৪৩৮২ টি দৈনিক শাখা নিয়মিত চলছে।

২০২৫ সাল সঙ্ঘের শতবর্ষ হতে চলেছে। তবে আমরা প্রতি তিন বছর পরপর সংগঠন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছি। মণ্ডল পর্যন্ত আমাদের কাজ করা উচিত। বর্তমানে দেশের ৬৪৮৩টি খণ্ডের মধ্যে ৫৬৮৩টিতে খণ্ডে কাজ চলছে। ৩২৬৮৭ মণ্ডলে কাজ রয়েছে, ৯১০ জেলার মধ্যে ৯০০ জেলায় কাজ রয়েছে, ৫৬০ জেলায় জেলা কেন্দ্রে পাঁচটি শাখা রয়েছে, ৮৪টি জেলায় সমস্ত মণ্ডলে শাখা রয়েছে। আমরা ভেবেছি আগামী তিন বছরে সঙ্ঘের কাজ (বছর ২০২৪) সমস্ত মণ্ডলে পৌঁছতে হবে। পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের জন্যও পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত যে কার্যকর্তা কমপক্ষে দুই বছর সময় দেবেন তাঁদের প্রস্তুত করা হবে, মার্চের মধ্যে এই সংখ্যা ঠিক হবে। করোনার কারণে নিয়মিত শাখা ব্যাহত হলেও যোগাযোগের ভিত্তিতে দেশের ১০৫৯৩৮টি স্থানে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়েছিল।

করোনার কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বয়ংসেবকরা জনগণের স্বনির্ভরতার জন্য কাজ শুরু করেছেন। স্বয়ংসেবকরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্থানীয় জনগণের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ব্যাংক ঋণ প্রদান ইত্যাদি কাজে সহায়তা করছেন। আগামী সময়ে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার চেষ্টা করব।

জনসংখ্যা নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিটি দেশেই জনসংখ্যা নীতি থাকা উচিত এবং তা সমাজের সব শ্রেণীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতার কথা মাথায় রেখে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষা নিত্যদিনের কাজ, শুধু দীপাবলিতে পটকা নিষিদ্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে, এমন নয়। বিশ্বের অনেক দেশেই আতশবাজি ব্যবহার করা হয়। তাই কী ধরনের আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হবে তা দেখতে হবে। বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, এই কাজে যুক্ত কর্মসংস্থান ও রোজগার নিয়েও ভাবতে হবে। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি সামগ্রিক এবং সময়োপযোগী আলোচনা হওয়া উচিত।

প্রতারণা বা লোভ দেখিয়ে কোনোভাবেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ধর্মান্তরণ ঠিক নয়, এটা মেনে নেওয়া যায় না। ধর্মান্তর বিরোধী বিলের বিরোধিতা কেন, তা সবার সামনে পরিষ্কার। হিমাচলে কংগ্রেস সরকার ধর্মান্তর বিরোধী বিল পাশ করেছে, অরুণাচলের কংগ্রেস সরকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইন পাশ করেছে। সুতরাং ধর্মান্তর বন্ধ করা উচিত এবং যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের ঘোষণা করা উচিত, ধর্মান্তরিতরা সরকারি ও অন্যান্য সুবিধা নিতে পারবে না। ধর্মান্তর বন্ধ করার জন্য যদি আইন করা হয় তবে আমরা স্বাগত জানাব।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল দ্বারা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ইসলামি মৌলবাদী আক্রমণের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছেঃ

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া সহিংসতা সম্পর্কে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং বাংলাদেশের আরও ইসলামীকরণের লক্ষ্যে জিহাদি গোষ্ঠীগুলির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ক্রমাগত বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ এবং হিন্দু উপাসনাস্থল ভাঙচুর করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি দুর্গাপূজার পবিত্র উৎসবের সময় যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে তাতে বহু নিরীহ হিন্দু নিহত হয়, শত শত হিন্দু আহত হয় এবং হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছে। দুই সপ্তাহ ধরে চলা এই জেহাদি তাণ্ডবে হিন্দু মন্দির ও দুর্গাপূজা প্যান্ডেল ভাঙচুর করা হয়েছে, হিন্দু সমাজে বহু নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন।

সমাজে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা উস্কে দেওয়ার জন্য ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিল এমন কিছু অভিযুক্তের গ্রেপ্তার, তাদের পরিচয় ও বয়ান থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দুর্গাপূজার সময় আক্রমণগুলো ইসলামি মৌলবাদীদের একটি সুনিপুণ ষড়যন্ত্র অনুসারে সংগঠিত হয়েছিল। হিন্দু জনগোষ্ঠী ও তাদের উপাসনাস্থলকে লক্ষ্যবস্তু করে বারংবার যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে তাতে এটা স্পষ্ট সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে অধুনা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে ফেলার একটি নিয়মমাফিক, সংগঠিত প্রচেষ্টা। ভারত ভাগের পর থেকেই ওদেশের হিন্দু জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে।

দেশভাগের সময় পূর্ব বঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ নাগরিক ছিলেন হিন্দু, তাদের সংখ্যা এখন প্রায় আট শতাংশে নেমে এসেছে। জামাত-এ-ইসলামি (বাংলাদেশ)-র মতো উগ্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলির নৃশংসতার ফলে দেশভাগের পর থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ব্যাপক সংখ্যায় উচ্ছেদ হওয়া হিন্দুরা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই সংগঠনগুলো এখনও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে চলেছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল মনে করে যে তাদের দেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্রমবর্ধমান ঘটনা রোধে বাংলাদেশ সরকারের উচিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে হিন্দু বিরোধী সহিংসতায় যুক্ত অপাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে এবং হিন্দুরা যাতে বাংলাদেশে তাদের নাগরিক অধিকার লাভ করে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন তাও নিশ্চিত করতে হবে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষার পাহারাদার সংস্থা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বাংলাদেশের ঘটনায় নীরবতার নিন্দা করছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই সহিংসতার নিন্দায় এগিয়ে আসার এবং বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবীতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে বাংলাদেশ বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে উগ্র ইসলামি শক্তির উত্থান বিশ্বের শান্তিপ্রিয় দেশগুলোর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত বহন করে। একই সঙ্গে অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যেন সম্ভাব্যরকম কূটনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণের ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের ক্ষোভ এবং উদ্বেগ বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয়।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ইসলামি সহিংসতার শিকার হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দু সমাজের সঙ্গে এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার সংকল্প ঘোষণা করছে। ◘

বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে

ব্রিটিশদের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত করে তুলেছিলেন

অনেকেই হয়তো বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের নাম শোনেননি, কিন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন বিপ্লবী যিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষকদের দুর্দশা দেখে তাঁর দৃঢ় মতামত ছিল যে, 'স্বরাজ' (স্ব-শাসন) একমাত্র সমাধান। বাসুদেব ফড়কে ১৮৪৫ সালের ৪ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার শিরধোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মনে করা হয় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ফড়কে ভারতের প্রথম বিপ্লবী যোদ্ধা যিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই অসীম সাহসী ছিলেন, বনেজঙ্গলে একা ঘুরতে পছন্দ করতেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, তিনি বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) চলে আসেন এবং পুনায় মিলিটারির হিসাব বিভাগে চাকরি পান। কিন্তু তিনি সর্বদা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, তাঁর উপর জাতীয়তাবাদী নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাসুদেব যখন মিলিটারির হিসাব বিভাগে কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্মকর্তারা তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেননি। তিনি ছুটি ছাড়াই তাঁর গ্রামে চলে যান। যখন তিনি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন, ততক্ষণে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চলে যান। তিনি জনজাতি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সেই বছরেই তাঁকে গ্রেফতার করে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। দেশের এই বীর সন্তান ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রঞ্জিত সিংহ

এক শক্তিশালী শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

শেরই-পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবের সিংহ, রঞ্জিত সিংহ ভারতের ইতিহাসের এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি পাঞ্জাবকে কেবল একটি শক্তিশালী প্রদেশ হিসেবেই গড়ে তোলেননি বরং তিনি ব্রিটিশদেরও তাঁর সাম্রাজ্যের নিকটে আসতে দেননি। রঞ্জিত সিংহ ১৭৮০ সালের ১৩ নভেম্বর গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমানে যা পাকিস্তানের অন্তর্গত। জন্মের পর তাঁর নামকরণ হয়েছিল বৌদ্ধ সিং। কিন্তু মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি তার বাবার সঙ্গে প্রথম বড় যুদ্ধ করেছিলেন।

জয়ের পর তাঁর বাবা সন্তানের নতুন নাম রাখেন রঞ্জিত। শৈশবে গুটিবসন্ত হওয়ায় তিনি বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। এক চোখ হারানোর পর তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর আমায় একটি চোখ দিয়েছেন, অতএব, আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, ধনী ও দরিদ্রকে সমান চোখে দেখি। মাত্র ১২ বছর বয়সে রঞ্জিত সিংহ পিতৃহারা হন। তারপরে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি পান এবং মা রাজ কৌর তাঁকে বড়ো করে তোলেন। ২০ বছর বয়সে রঞ্জিত সিংহ পাঞ্জাব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮০১ সালের ১২ এপ্রিল, রঞ্জিত সিংহ পাঞ্জাবের মহারাজা হন। তিনি একাধিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং পূর্ব পাঞ্জাবের কিছু অংশ দখল করে এক শক্তিশালী শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি

অমৃতসরের হরমন্দির সাহিবকে সোনায় সজ্জিত করে স্বর্ণমন্দিরে রূপান্তরিত করেন। তিনি তাঁর সভার সদস্যদের বলতেন, আমি একজন কৃষক এবং একজন সৈনিক, আমার কোনো ভান করার দরকার নেই। আমার তলোয়ার হলো এমন এক জিনিস যা আমার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে, যা আমার প্রয়োজন।

কুনওয়ার সিং

৮০ বছর বয়সেও বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭) অবতীর্ণ মহান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাবু বীর কুনওয়ার সিং। ৮০ বছর বয়সেও তিনি লড়াই করেছিলেন। বাবু কুনওয়ার সিং শুধুমাত্র একজন দক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন তাই নয় তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসম সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্যও তিনি সমানভাবে কাজ করেছিলেন। তিনি ১৭৭৭ সালের ১৩ নভেম্বর বিহারের ভোজপুর জেলার জগদীশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর কুনওয়ার সিং তাঁর পিতার রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ঘোড়ায় চড়া, তরবারি চালানো এবং কুস্তিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি গেরিলা যুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে জগদীশপুরের জঙ্গলে 'বাঁসুরি বাবা' নামে একজন সাধু থাকতেন, যার কাছ থেকে কুনওয়ার সিং দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার পাঠ পেয়েছিলেন। এই কারণেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল নির্ধারণের জন্য কুনওয়ার সিং বারাণসী, মথুরা, কানপুর এবং লখনউয়ের মতো অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর সাহসিকতার কাহিনি বিহারের লোককাহিনিতে পরিণত হয়েছে। এরকম একটি কাহিনি হলো, একবার তাঁর এক হাতে গুলি লেগেছিল। কথিত আছে যে তিনি সেই হাত কেটে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। কুনওয়ার সিং শুধু একজন মহান যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের এই মহান বীর ১৮৫৮ সালের ২৬ এপ্রিল প্রাণত্যাগ করেন।

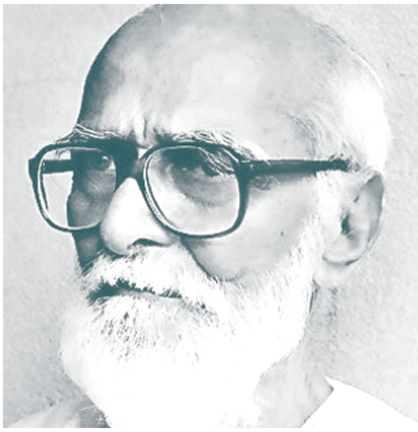

কালোজী নারায়ণ রাও

কবিতার মধ্যে দিয়ে ভারতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন

কালোজী নারায়ণ রাও ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও একজন সমাজকর্মী। তিনি 'কালেজী' বা 'কালনা' নামেও পরিচিত ছিলেন। কালোজী নারায়ণ রাওকে 'প্রজা কবি' -ও (জনগণের কবি) বলা হতো। রাও ১৯১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের রত্তিহল্লি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাও শুধুমাত্র নিজামের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের নেতৃত্বই দেননি বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকারী তৎকালীন যুবকদের জন্যও তিনি ছিলেন এক মহৎ অনুপ্রেরণা। সারা জীবন, তিনি সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সমাজের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি তাঁর সকল কাজে প্রতিফলিত হয়। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে জন অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দুই বছর অন্ধ্রপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্যও ছিলেন। তিনি অন্ধ্র সরস্বতী পরিষদ, অন্ধ্র প্রদেশ সাক্ষরতা অ্যাকাডেমির সদস্য এবং তেলঙ্গনা লেখক সমিতির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি আর্য সমাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট কবি খলিল জিব্রানের উর্দু কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক সেরা অনুবাদকের পুরস্কারে ভূষিত হন। কাকতিয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছে। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করেন। ২০০২ সালের ১৩ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

(নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সৌজন্যে)

হিন্দুধর্মের সর্বনাশ এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য দমনমূলক ওয়াকফ আইন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী বেআইনিভাবে ভয়ংকর রকমে সংবিধান লঙ্ঘন করেছিলেন। তখন লোকসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ; সেই সময় একাই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক এই শব্দ দুটি যোগ করেন, কোন তারিখ থেকে তা চালু হলো তা উল্লেখ না করেই। নিয়ম মোতাবেক সংসদের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সমেত বিল পাশ করিয়ে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে তবে সংবিধান সংশোধন করাতে হয়। তিনি এসব কিছুই করেননি। তবে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত ওপেন সিক্রেট ছিল হিন্দুধর্মের নাশ ও অন্য দুই সম্প্রদায়ের তোষণ ও শ্রীবৃদ্ধি। এই পোষণের অন্যতম উদাহরণ দমনমূলক বা ড্র্যাকোনিয়ান ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫।

৪০ ধারা দেখুন। ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা।

ওয়াকফ বোর্ড যে কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করতে পারে। ওয়াকফ আইনের ক্লজ (১) বলছে—

The Board may itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be waqaf property and..... it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question।

এবং ক্লজ ২ বলছে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত—The decision of the Board on a question under sub-section (1) shall, unless revoked or modified by the Tribunal, be final.

ক্লজ বা উপধারা ৩ অনুসারে ভারতের ট্রাস্ট আইন ১৮৮২ বা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৮৬০ অনুসারে বা অন্য যে কোনো আইনে রেজিস্ট্রিকৃত আপনার আমার সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোর্ড যদি ওয়াকফ সম্পত্তি মনে করে তবে হয়ে গেল, তা মুসলমানদের সম্পত্তি হয়ে যাবে। ঐ সব আইনে যাই থাকুক

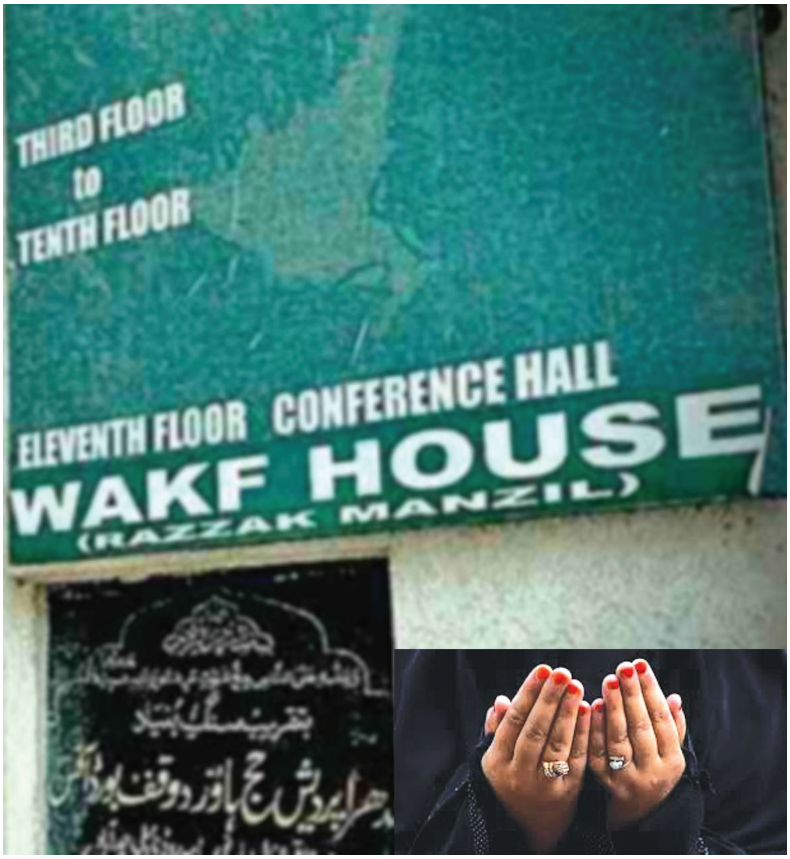

১৯৯৩ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৯ কোটি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি অনুযায়ী কোনো দেশের ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা যদি ১.৫% বা তার কম হয় তাকে সংখ্যালঘু বলা যাবে। এবার ভাবুন ৫০,০০০ পার্সির পাশে ১৫ বা ১৬% মুসলমান কীভাবে সংখ্যালঘু হতে পারে?

না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। বোর্ড এসব ট্রাস্ট বা সোসাইটিকে তলব করে বলবে তোমরা তোমাদের সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে রেজিস্ট্রি করাও নতুবা কারণ দর্শাও কেন এইভাবে রেজিস্ট্রি করা যাবে না। এইসব ক্ষেত্রে এই উপধারা বা ক্লজের অধীনে যে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে তার বিজ্ঞপ্তি সেই কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে যেমন জেলা সমাহর্তা বা রেজিস্ট্রারকে। এইসব কর্তৃপক্ষকে বোর্ড কার্যত হুকুম জারি করবে তোমরা রেজিস্ট্রি করো এই সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে। এই 'সেকুলার', তোষণকারী সমাজ-রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কারো ঘাড়ে মাথা নেই তার অন্যথা করে। সেখানে সেই বোর্ডে যদি কোনো হিন্দুকে রাখা হয় সে তো আরো বেশি সমর্থন করবে। 'আমি তো পিঠ পেতে রেখেছি মারো আমাকে'।

উপধারা বা ক্লজ ৪ অনুসারে ক্লজ ৩ এর অধীনে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা বিবেচনা করে বোর্ড যা মনে করবে সেই মত আদেশ জারি করবে আর এই আদেশ বা ফতোয়া চূড়ান্ত হবে যদি না ট্রাইবুনাল দ্বারা তা বাতিল বা সংশোধিত হয়।

২০০৫ সালে তাজমহলকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে এএসআই এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে তা ঝুলে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

মন্দিরের সব জমি এনক্রোচ হয়েছে বা সরকার তা দান করে দিয়েছে বা দেওয়ার আইনী প্রক্রিয়া চলছে। কোনো প্রতিকার নেই। আমরা কোন দেশে বাস করছি!

এরপর ধারা ৫১।

এই ধারার উপধারা বা ক্লজ ১এ বলা আছে এই ওয়াকফ দলিলে যাই থাকুক না কেন, ওয়াকফ বোর্ডের অগ্রিম অনুমোদন বিনা ওয়াকফ সম্পত্তি ব'লে ঘোষিত সব সম্পত্তির সব দান, বিক্রি, বিনিময় বা বন্ধক বাতিল হবে—কোনো মসজিদ, দরগা বা খানগাহ দান, বিক্রি বা বন্ধক রাখা চলবে না; সে ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন চালু থাকবে! অথচ আপনার বসত বাড়ি যদি ওয়াকফ বোর্ড মনে করে তা মুসলমানরা ওয়াকফ আইনে যে কোনো দিন কেড়ে নিতে পারে। হিন্দুরা যদি মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি ফেরত চায় (যা এখন কড়া পাহারায় মসজিদ বলে চলছে) তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে হয়েছে। উল্টো দিকে যে কোনো স্থানকে মুসলমানরা ফেরত চাইতে পারে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের অনুকূল রায় ছাড়া বিক্ষুব্ধ হিন্দু তা উদ্ধার করতে পারবে না।

ধারা ৫২

৫১ ধারা লঙ্ঘন করে কোনো ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে (উপধারা ১) উপযুক্ত তদন্তের পরে বোর্ড যদি সন্তুষ্ট হয় যে কোনো স্থাবর ওয়াকফ সম্পত্তি বোর্ডের অগ্রিম অনুমতি বিনা হস্তান্তরিত হয়েছে বোর্ড জেলা কালেক্টরকে হুকুম করবে ঐ সম্পত্তি বর্তমান দখলদারি মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বোর্ডকে তার দখল দিতে। জেলা কালেক্টর ওই হুকুম পাওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে বোর্ডের দখলে তা ফিরিয়ে দেবে। যদি বর্তমান দখলকারি মালিক অনুপস্থিত থাকে তবে কালেক্টর যে কোনো জায়গায় এই হুকুম লটকে দিতে পারবে এবং বর্তমান মালিক যদি এইরকম হুকুম এইভাবে লটকানোর পর তিরিশ দিনের মধ্যে আপিল না করে তবে আর কিছু করার থাকবে না। এক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত তারাই সুপার বসা কোর্টে যাওয়ার দরকার নেই। এর চেয়ে বড় মুঘলি কানুন নেই। একটা দেশের সংসদ কি করে এই আইন পাশ করল! পাকিস্তানেও এই আইন নেই!!!

৫৪ নম্বর ধারায় বলা আছে কোনো ব্যক্তি যিনি আইন মোতাবেক লাইসেন্সী, মর্টগেজি বা লেসি হিসাবে কোনো জমির দখলি স্বত্ব ভোগ করছেন তাকেও বোর্ড দখলচ্যুত করতে পারবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি কোনো ওয়াকফ বা মুতাওল্লি কাউকে এইরকম অধিকার দিয়ে থাকে তাহ'লে এই আইন খাটবে না।

৮৩ নম্বর ধারায় বলা আছে এই বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেবল এবং কেবল মাত্র বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনালে আপীল করা যাবে, কোনো জেলা বা মহকুমা স্তরের আদালতে আপীল করা যাবে না। কেবল মাত্র হাইকোর্ট যদি মনে করে বা যদি বিক্ষুব্ধ পক্ষ অভিযোগ করে তবে হাইকোর্ট তার যথার্থ্য নির্ণয় করবে। আপনারা জানেন হাইকোর্টে রিট পিটিশনে যাওয়ার জন্য কতখানি অর্থ সময় ও লোকবলের প্রয়োজন হয়।

ধারা ৮৯—বোর্ড যা খুশি সিদ্ধান্ত নিক না কেন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার বিরুদ্ধে কোনো আপিল করতে পারবে না—তাকে আগে ঐ বোর্ডের কাছে নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশ সার্ভ করার পর দু' মাস অতিক্রান্ত হলে তবেই আপিল করা যাবে।

ধারা ৯২ মতে বোর্ডকে পার্টি না করলেও তারা এসে সওয়াল করতে পারবে।

ধারা ১০১ মতে বোর্ডের সবাইকে সরকারি কর্মচারী বা পাব্লিক সার্ভেন্ট হিসাবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ তাদের কাউকে এইরূপ আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ (তারা সাধারণত হিন্দুই বেশি হবে) কোনো প্রশ্ন করলে তারা দৈহিক হেনস্থার অভিযোগে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার আবেদন করবো। এইভাবে যে কত কত লাখ লোককে পাব্লিক সার্ভেন্ট বানানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আরও সাংঘাতিক কথা বলা আছে **ধারা ১০৭এ**—

১৯৬৩-র ৩৬ আইন অনুসারে ওয়াকফ আইন উদ্ধারের জন্য প্রযোজ্য নয়। ১৯৬৩ সালের লিমিটেশন আইনের অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুই ওয়াকফের কোনো স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ করা বা ঐ সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত কোনো লাভ অধিকারের জন্য লাগু হবে না। ওয়াকফ যে কোনো অবস্থায় তাদের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবে।

মুসলিম এমপি, এমএলএ, মুসলিম জয়েন্ট সেক্রেটারি, মুতোয়াল্লি, মুসলিম নগর পরিকল্পক সব ধর্মীয় ব্যক্তি এবং এলেমের জোরে তারা মন্ত্রী হওয়ার জন্য তদারকি করবে।

আমরা দু'টাকার চাল, সস্তা পেট্রল পেঁয়াজের জন্য রাস্তায় নামি। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিণামবাহী আইনের বিরুদ্ধে মৌনতা অবলম্বন করি। প্লেসেস অব ওয়রশিপ অ্যাক্ট অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যত মুসলিম মসজিদ বা খ্রিস্টান চার্চ আছে তা হিন্দু মন্দির, শিখ গুরুদ্বার বা বৌদ্ধ মঠ জবর দখল করে হয়ে থাকলেও তার স্ট্যাটাস বহাল থাকবে। বাবরি ধাঁচা ভাঙার পর মুসলমানদের তোষণ করার জন্য এই সাংঘাতিক ওয়াকফ আইন চালু হয়েছে। ১৯৯৩ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৯ কোটি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি অনুযায়ী কোনো দেশের ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা যদি ১.৫% বা তার কম হয় তাকে সংখ্যালঘু বলা যাবে। এবার ভাবুন ৫০,০০০ পার্সির পাশে ১৫ বা ১৬% মুসলমান কীভাবে সংখ্যালঘু হতে পারে? □

মাস্ক নিয়ে মশকরা নয়

কৌশিক রায়

করোনা প্রতিরোধে মুখাবরণ বা মাস্ক আবশ্যিক। তবে, মৃত্যুভয় থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তরের এবং চিকিৎসকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবাণুর সঠিক প্রতিবন্ধক- সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার না করে বিভিন্ন ফুল আর চটকদার মোটিফ-এর ডিজাইন, বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা-সুপারহিরোর ছবি আর লেখার গ্রাফিত্তিযুক্ত কাপড়ের বা সিন্থেটিক মাস্ক ব্যবহার করে চলেছি। এর ফলে কোভিড সংক্রমণের আশঙ্কা কিন্তু বাড়ছে বই কমছে না। তবে, এই মাস্ক পরা নিয়ে কিছু সাবধানতা আমাদের মেনে চলতেই হবে।

থুতনির নীচে মাস্ক রাখা বা নাকের নীচে মাস্ক পরার অর্থ বর্তমানে বহু ভাবে আবির্ভূত কোভিড বাবাজীকে একেবারেই আমাদের শ্বাসনালী আর ফুসফুসের সিংহদরজা দেখিয়ে দেওয়া। ব্যবহৃত ফেস মাস্ক অনেকে আবার ব্যয় সংকোচের জন্য ধুয়ে পুনর্ব্যবহার করছেন। এদিকে, তেনাদের বাড়িতে এ.সি., রাইস কুকার, 'ট্যাব' মাইক্রোওয়েভ আভেন, দেওয়ালজোড়া টিভি, মড্যুলার কিচেন আছে। তাঁদের মনে রাখতেই হবে— একদিন ব্যবহার করার পরই সার্জিক্যাল মাস্কটি চিরতরে বর্জনীয়।

দেখা যাচ্ছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেমন অনেকের তালুতে অ্যালার্জি বা ফুসকুড়ি ঘটাচ্ছে, তেমনি মাস্কও অনেকের মুখেই অহেতুক র‍্যাশ, চামড়ায় লালচে ভাব, ব্রণ ও এক্জিমার মতো উপসর্গ তৈরি করছে। সাধারণত, ঘরে চার জনের বেশি লোক না থাকলে মাস্ক না পরলেও চলবে। তবে, এই অতিমারী আবহে কর্মস্থলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিড-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করার সময় এবং মুদি সবজির দোকানে অবশ্যই শারীরিক দূরত্ব এবং মাস্কের সাহায্য নিতে হবে আমাদের। মাস্কজনিত ব্রণ ও চুলকানি দিন দুয়েকের মধ্যেই সাধারণত মিলিয়ে যায়। তবে মাস্ক জনিত ব্রণ ও মেচেতার জন্য বাজার-চলতি, ব্র্যান্ডেড অ্যান্টি-পিম্পল ক্রিম ব্যবহার না করাটাই ভালো বলে জানিয়েছেন দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের ফর্টিস হাসপাতালের ত্বক বিশেষজ্ঞ বা ডার্মাটোলজিস্ট ডাঃ রেশমি শর্মা।

সাধারণত, মাস্ক পরলে অনেকের নাকের খাঁজ, চোয়াল, চিবুক ও গালে র‍্যাশ ও চুলকানি দেখা দিচ্ছে। এর কারণ হলো মুখের তৈলগ্রন্থি, ঘাম, তেলতেলে ভাব ও বায়ুর আর্দ্রতা। এগুলির ফলে মুখের রোমকূপগুলি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর মাস্ক পরলে কাপড়ের ঘর্ষণের ফলে মুখে ব্ল্যাকহেড্স, হোয়াইট হেডস (Close Comedones) ও ফুসকুড়ির (Pustules) মতো উপসর্গগুলি দেখা দেয়। এই ধরনের 'মাস্কনি' (Maskne)-কে নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন অনেকেই বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে মাস্কমুখে ব্যাঙ্ক ও স্বাস্থ্যকর্মী, ট্র্যাফিক পুলিশ, বাহন চালক ও দোকানদার-রা। দীর্ঘ সময় মাস্ক পরলে মুখে গরম বাতাস এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যক্ত কার্বন-ডাই- অক্সাইডের কিছুটা অংশও জমা হয়। এই ধরনের গরম হাওয়াও মুখে ব্রণ-র‍্যাশ তৈরি করতে পারে। তাই বাড়িতে ফিরে মাস্ক খুলে মুখ আগে ভালো সাবান বা ক্লিন্জার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সিরামাইড আর হাইঅ্যাল্যুওরোনিক অ্যাসিড যুক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলেও মাস্ক-জনিত চর্মরোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। হ্যান্ড ওয়াশ নিয়মিত ব্যবহার করলে হাতের ময়লা মুখে আসবে না। এছাড়া, মাঝে মধ্যেই ভালো সাবান ও ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে। অতিমাত্রায় ঝাল মশলাযুক্ত রান্নাবান্না মুখের রোমকূপের তৈলহীনতা বজায় রাখার জন্য বেশি না খাওয়াই ভালো। এক্ষেত্রে করলা, পেঁপে, ঢ্যাঁড়শের মতো সবজিকে সেদ্ধ করে এবং ভিটামিন-সি যুক্ত সাইট্রাস জাতীয় ফল খাওয়া ভালো। এছাড়া, মুখের রোমকূপকে পরিষ্কার রাখার জন্য হাইড্রোকোলোয়েড ড্রেসিং এবং অ্যালকোহল-বিহীন এক্সফোলিয়েটর ব্যবহার করাও যেতে পারে। যারা রোদে বেরোচ্ছেন তাঁরা মাস্ক লাগানোর আগে মুখে ডে ক্রিম লাগালে (বিশেষ করে মাস্ক-এর সবচেয়ে বেশি চাপ খাওয়া নাকের খাঁজ বা ন্যাসাল রিজ-এর ওপর) ভালো হয়। এছাড়া স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, বেন্জোইল পারঅক্সাইড এবং রেটিনয়েড যুক্ত ফেসক্রিম ব্যবহার করলেও 'মাস্কনি' অনেকটাই কমে যায়। তবে, সবক্ষেত্রেই ত্বক রোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কোভিড সময়ে বেশিমাত্রায় মুখ প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য, হাওয়া চলাচল করতে পারে এরকম কটন আর শিফন কাপড়ের মাস্কও পরা যেতে পারে। তবে, মাস্ক পরা নিয়ে যাঁদের অভিযোগ আর বিরক্তির অন্ত নেই তাঁরা একবার ভেবে দেখুন, বারোমাস বোরখাবৃতা মুসলমান মা-বোনেদের অবস্থা। ☐

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৩।।